বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে গৃহীত প্রতিবেদন

ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলাদেশের জাতীয় পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

ভূমিকা

গত ২০-২৩ নভেম্বর ২০১৪ আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত ও বিকশিত রূপ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণতিতে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের ভিত্তিতে দলের চিন্তাকে সংহত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্ট ২০১২ সালে সূচিত এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ওই কনভেনশনে সমকালীন বিষয়াবলী যুক্ত করে জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। কনভেনশনের প্রতিনিধিদের প্রস্তাব, সংশোধনী মতামত যুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য
বাসদ (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলাদেশের জাতীয় পরিস্থিতি

সংগ্রামের ধারাবাহিকতা আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০-২২ নভেম্বর পার্টির বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কনভেনশনের প্রাক্কালে জাতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা অতীতের ন্যায় বর্তমানেও মনে করি যে, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকটের মূলে পুঁজি আর শ্রমের অনিরসনীয় দ্বন্দ্বই প্রধান নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়াশীল। এর সাথে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্ব। এই দুটি দ্বন্দ্বই প্রধানতঃ বাংলাদেশের জাতীয় পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ব্রিটিশ ভারতে পুঁজির উদ্ভব এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পর ভারতবর্ষসহ বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ বণিকী পুঁজি বাংলার তৎকালীন বণিকী পুঁজির সাথে বাণিজ্যিক সুবিধার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সামন্তপ্রভুদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতালোভী মিরজাফর সিরাজদৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত করে। এক্ষেত্রে বলা চলে 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে একে একে অন্যত্র নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। কোম্পানির শাসনামলে তৎকালীন ভারতবর্ষে কোম্পানি তার মুনাফার স্বার্থে আঞ্চলিক উপজাতীয় সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। যদিও তৎকালীন ভারতবর্ষে এ সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল সামন্তীয় ভূমি ব্যবস্থা, যা ইতিমধ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে একে উচ্ছেদ করার আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ১৭৫৭ সাল অবধি ভারতবর্ষে সামন্তীয় ভূমি ব্যবস্থা স্থায়ীভাবেই টিকে ছিল। সেসময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা, লোকজ শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষি, কুটির শিল্প, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করলো। এর মধ্য দিয়ে অতীতের সকল ধারাবাহিকতা থেকে জবরদস্তিমূলক ছেদ ঘটালো, যা এদেশের মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারল না। তার সাথে উৎকটভাবে জড়িত ছিল কোম্পানির মুনাফার স্বার্থটি। পশ্চিমা দেশসমূহে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজকে সম্মুখবর্তী করার উদ্দেশ্যে অতীত সমাজব্যবস্থার মূল উৎপাটনের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, আর এর ভ্রূণ ছিল ঐসকল সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে সামন্তীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙন এবং সংশ্লিষ্ট উপরিকাঠামোসমূহের উপর আক্রমণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জবরদস্তিমূলক বল প্রয়োগের মাধ্যমে করেছিল, তাই তা সামাজিক আন্দোলনের রূপে পশ্চাৎপদ উৎপাদন ও সামাজিক ব্যবস্থার ফাঁদে আটকে থাকা জনসাধারণের মাঝে মুক্তির বার্তাস্বরূপ আসেনি। বরং তা আরো বড় ধরণের শোষণ ও অত্যাচারের রূপে এ জনপদের মানুষের কাছে নিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়। মহামতি কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে New-York Herald Tribune-এ প্রকাশিত The British Rule in India প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "ইংল্যান্ড ইউরোপীয় বাজার থেকে ভারতীয় সুতা উচ্ছেদ শুরু করল; পরে তারা হিন্দুস্থানে তন্তু পাঠানো শুরু করল এবং সবশেষে তারা সুতা উৎপাদনের জননী দেশটিতে সুতার প্লাবন বইয়ে দিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল অবধি যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে তন্তু রপ্তানির অনুপাত বেড়ে দাঁড়ালো ১ থেকে ৫২০০। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ মসলিন ভারতে রপ্তানির পরিমাণ খুব বেশী হলে ১০ লক্ষ গজ ছিল যা ১৮৩৭ সালে বেড়ে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু একই সময়ে ঢাকায় জনবসতি ১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে কমে ২০ হাজারে নেমে আসে। নিজেদের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত এসকল ভারতীয় শহরগুলোর ক্রমাবনতিই সবচাইতে মন্দ পরিস্থিতি হিসাবে বিদ্যমান ছিল এমন নয়। ব্রিটিশ বাষ্প এবং বিজ্ঞান হিন্দুস্থানের সমগ্র অঞ্চল থেকে কৃষি ও শিল্পের মেলবন্ধনকে উচ্ছেদ করে দিল।"

১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত একশত বৎসর ব্যাপী বহু বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসকল বিদ্রোহের চরিত্র ছিল আঞ্চলিক। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার মধ্য দিয়ে ইংরেজ তাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে এক নতুন ধরণের জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করল। এযাবৎকাল জমির মালিকানা হস্তান্তর কেবলমাত্র সামন্তীয় কায়দায় অর্থাৎ উত্তরাধিকার অথবা অনুদান বা উপহারের মধ্য দিয়ে সম্ভব হত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার মাধ্যমে জমি কেনাবেচার সামগ্রীতে পরিণত হল। ফলে মালিকানার পরিবর্তন কেবলমাত্র সামন্তীয় ভূস্বামীর ইচ্ছামাফিক হতে হবে এ বাধ্যবাধকতার অবসান ঘটিয়ে তা প্রকারান্তরে ইংরেজ শাসকদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এই প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে একদিকে যেমন কোম্পানি পুঁজির লুণ্ঠন ব্যাপকতর হয়, পাশাপাশি দেশীয় পুঁজিবাদ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে থাকে। এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার মাধ্যমে ইংরেজ কর্তৃক একজন জমিদারের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হত। জমিদার ইংরেজকে কর প্রদানে ব্যর্থ হলে জমি ইংরেজরা ক্রোক করে নিত। ইংরেজরা আবার এসকল জমি উচ্চ দরে নিলামে বিক্রি করে দিত। জমিদার উচ্চ এ করের বোঝা কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিত। কৃষক জমিদারকে কর প্রদানের লক্ষ্যে মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিত যা তাদের পক্ষে কোনভাবেই শোধ দেওয়া সম্ভব হত না। ফলে তারা বন্ড শ্রমিকে পরিণত হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য হত। এ পরিস্থিতি জনসাধারণ কখনও শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয়নি। মাঝেমধ্যেই এসকল বিরোধ-সংঘর্ষ বিদ্রোহরূপে দেখা দিত। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল সময় পর্যন্ত বড় বড় আন্দোলন-সংগ্রামগুলোর মধ্যে ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভীল, কোল বিদ্রোহ প্রখ্যাত।

এসকল বিক্ষিপ্ত আঞ্চলিক অসন্তোষ আর বিদ্রোহ দানা বেঁধে লক্ষ-কোটি ভারতবাসীর অপমান, লাঞ্ছণা ও বিদেশিদের হাতে পদানত হওয়ার জ্বালা বুকে ধারণ করে তৎকালীন ব্রিটিশ আর্মিতে যে সকল ভারতীয় সেনা নিযুক্ত ছিল তারা সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। ১৮৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১৮৫৮ সালের ২০ জুন অর্থাৎ প্রায় এক বছরের অধিক প্রতিরোধ সংগ্রামের এধারা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহ একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান

তথাপি রক্তের অক্ষরে এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অনেক অমোঘ সত্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই মহান মার্কস New York Herald Tribune-এ প্রকাশিত The Revolt in the Indian Army প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "… the rebels at Delhi are very likely to succumb without any prolonged resistance. Yet, even then, it is only the prologue of a most terrible tragedy that will have to be enacted." অর্থাৎ, "দিল্লীর বিদ্রোহীরা কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ছাড়াই পরাজিত হতে চলেছে। কিন্তু তারপরও এটি ভবিষ্যতে যে অত্যন্ত বিয়োগান্তক পরিস্থিতি ঘটতে চলেছে তার সূচনা মাত্র।"

এরই মাঝে ভারতে কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত উদীয়মান কিছু তরুণ-তরুণীর সৃষ্টি হয়। ১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট New-York Daily Tribune-এ প্রকাশিত The Future Results of British Rule in India নামক অপর এক প্রবন্ধে কার্ল মার্কস উল্লেখ করেন, "Indian society has no history at all, at least no known history. What we call its history, is but the history of the successive intruders who founded their empires on the passive basis of that unresisting and unchanging society. …From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta, under English superintendence, a fresh class is springing up, endowed with the requirements for government and imbued with European science." অর্থাৎ, "ভারতীয় সমাজের একেবারেই কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস নেই। যাকে আমরা ইতিহাস বলে জানি তা হল বিভিন্ন পরম্পরায় অনুপ্রবেশকারীদের ইতিহাস যারা একটি প্রতিরোধহীন এবং অপরিপবর্তনীয় সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তির উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। … ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় আদিবাসী থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে কলকাতায় একটি নবীন শিক্ষিত শ্রেণীর উত্থান ঘটছে যারা সরকার গঠনের প্রয়োজনে সমর্পিত এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত।" তখনও ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ধারণা আসেনি। সেসময়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে একদল শিক্ষিত মানুষের জন্ম হয় এবং তারা ধীরে ধীরে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে মুক্ত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতেই নবজাগরণের সূচনা হয়। প্রথম নবজাগরণের উদগাতা ছিলেন রাজা রামমোহন, তিনি অনেকটা ইউরোপের মার্টিন লুথারের ধর্মীয় সংস্কারের পথেই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটান। তারপরই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান, তিনিই প্রথম ধর্মীয় শৃঙ্খলমুক্ত নবজাগরণের চিন্তাকে তুলে ধরেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ধর্মীয় চিন্তাকেই প্রাধান্য দেন এবং ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদের বিরোধিতা করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের নবজাগরণ আন্দোলনের মাঝেই ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী তিন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রাই এবং বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল। ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের মূলধারায় আধ্যাত্মবাদী ভাবধারা মিলেমিশে ছিল। তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এঁদের বিরাট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এতবড় মনীষীদের বিপুল আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে দূর হয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথও একই আধ্যাত্মবাদী চিন্তার পথিক ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করে সর্বধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন যা বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে বিদ্যাসাগরের সেক্যুলার মানবতাবাদ অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতামুক্ত মানবতাবাদকে আরও উন্নত ও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন শরৎচন্দ্র। নজরুলও প্রথমদিকে প্রধানত এই চিন্তার পথিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী হলেও রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষে ছিলেন। নজরুল শেষদিকে কিছুটা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়লেও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র শেষদিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জাতীয় বুর্জোয়াদের আপোষকামী অংশের স্বার্থে প্রধানত ধর্মভিত্তিক ও সশস্ত্রবিপ্লব বিরোধী ছিল। রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা আতঙ্কিত হয়ে এই পথ নিয়েছিলেন এবং গান্ধীজী তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসকে সামনে রেখে পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে দেয়নি।

মহান স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে ভারতে কমিউনিস্টদের আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদের সাথে ঐক্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারত যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ, তখনই ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন ভারত সম্পর্কে বলেছিলেন, "ভারতের মতো উপনিবেশগুলির মৌলিক ও নতুন বৈশিষ্ট্য শুধু এটাই নয় যে, এখানকার জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী দল ও আপষকামী দল এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, বরং প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বুর্জোয়াদের আপোষকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বেশি বিপ্লবের ভয় থেকে এরা নিজের দেশের শ্রমিক ও চাষীর বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্লক বা জোট গড়েছে … শহর ও গ্রামের পেটিবুর্জোয়া জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের আপোষকামী অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পর, বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে জোট গঠন করতে পারে এবং তা করতেই হবে।" (Tasks of the university of the peoples of the east, collected works, volume 7) পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ মার্কসবাদী না হওয়ায় আগাগোড়াই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লববাদের পক্ষে না দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য করেছে। এমনকি ২য় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি ও জাপান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটিশ-মার্কিন-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করার অজুহাত দেখিয়ে ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহের বিরোধিতা করে জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিল। এর জন্য যুদ্ধের পর স্ট্যালিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কৌশল হিসাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করে লড়াই করেছিলেন। এই কৌশল ঠিক ছিল

কি ভুল ছিল এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন করা চলেনা। তাঁর এই লড়াইয়ের পক্ষে ভারতে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সি.পি.আই সুভাষচন্দ্রকে নেহেরুর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জাপানের দালাল আখ্যা দিয়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ট্রায়াল নিয়ে বিশেষতঃ কর্নেল রসিদ আলীর ট্রায়ালের বিরুদ্ধে ভারতে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মত আন্দোলন গড়ে উঠে, যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভয় পেয়ে ট্রায়াল বন্ধ করে দেয়। না হলে মেজর জেনারেল শাহ্নেওয়াজ, কর্নেল ধীলনসহ অনেকেরই ফাঁসি হয়ে যেত। সি.পি.আই কিন্তু অমার্কসবাদী ভূমিকার জন্য এ লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই মার্কসবাদ, কমিউনিজম ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ফলে সি.পি.আই স্ট্যালিনের গাইডলাইন অনুসরণ না করায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিকল্প বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ ব্যর্থ হয়ে গেল।

জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সর্বধর্মের ঐক্যের কথা বললেও মূলতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্যই ছিল। যার ফলে এমনকি হিন্দুদের মধ্যে যাদের নিম্নবর্ণ বলা হয়, তারাও একসময় আলাদা 'সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' গঠন করে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের প্রথম ক্যাবিনেটে তাদের একজন মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল ছিলেন। ব্রিটিশরা যখন ভারতে ক্ষমতা দখল করতে থাকে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম বাদশা ও নবাবদের ক্ষমতাচ্যুত করে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জনের মানসিকতা ছিল, যেটা হিন্দুদের মধ্যে ছিলনা। এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্যের নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রভাব খুবই দুর্বল ছিল। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিল এবং জাতির জনক বলে আখ্যায়িত গান্ধী হিন্দু সন্ন্যাসীরূপেই ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বের বর্ণবাদী ঝোঁক ছিল। এর সুযোগ একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যদিকে মুসলিম ধর্মীয় শিল্পপতি ও সামন্তপ্রভুরা নিয়েছিল, কারণ জাতীয় কংগ্রেস যথার্থ সেক্যুলারিজমের চর্চা না করায় এবং হিন্দু ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকায় মুসলিম জনগণকে আকর্ষণ করতে পারেনি। যদিও এতদ্সত্তেও স্বল্পসংখ্যক হলেও কিছু বিশিষ্ট মুসলিম নেতা শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসে ছিলেন। এমনকি প্রথমদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে ধর্মের, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থাকায় ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত হয়ে একদল ক্ষমতালিপ্সু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম শিল্পপতি, সামন্তপ্রভু ও রাজনৈতিক নেতা কংগ্রেস শাসিত ভারতবর্ষকে হিন্দুদের রাজত্ব হিসাবে চিহ্নিত করে মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে এবং দেশভাগ প্রশ্ন নিয়ে সাধারণ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে তীব্র দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জাতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে একমাত্র দুজন সদস্য সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গাফ্ফার খান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশভাগের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। অন্যদিকে সি.পি.আই হিন্দু ও মুসলিম আলাদা জাতি এই বিচিত্র তত্ত্ব হাজির করে দেশভাগ সমর্থন করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ২য় বিশ্বযুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে। অন্যদিকে চীনে মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং চক্রকে পরাস্ত করে মুক্তি অর্জনের পথে, ভিয়েতনামেও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শক্তিশালী মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, ২য় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের মর্যাদা ও প্রাধান্য বৃদ্ধি করছিল। এর প্রভাব ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যেও পড়ছিল। ভারতের অভ্যন্তরে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর লড়াইয়ের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে প্রবল সশস্ত্র বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল, ১৯৪৫ সালে নৌ বাহিনীর বিদ্রোহ ঘটেছিল – এ সব মিলিয়ে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে বোঝাপড়া করে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দেশভাগ করে। দুই দেশের দ্বন্দ্ব-বিরোধের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে, বিপ্লবভীত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দ সাথে সাথে তা মেনে নেয়।

তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আপোষমুখী ধারাটি জায়গা করে নিতে পেরেছিল কারণ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জন করে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়েছিল। যদিও এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত হওয়ার নেপথ্যে সিপাহী বিদ্রোহসহ তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী রক্তস্নাত বিদ্রোহ-বিপ্লবই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে এবং ইংরেজ যখন বুঝতে পারল যে তার হিংস্র থাবা থেকে ভারত ক্রমাগত সরে যাচ্ছে তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে "Half baked, truncated" (আধসেকা রুটি) অবস্থায় রেখে দ্রুত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে উদ্যত হল। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিহাসিক পথে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দুটি দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে। পেছনে পড়ে থাকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের দুঃসহ স্মৃতি যা গ্রেট ব্রিটেন পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছিল। ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের ঘৃণার ঘূর্ণিতে দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষ ঘুরছিল। ভারতবাসীদের গৃহ বিভক্ত হলো, জমি বিভক্ত হলো, পরিবার বিভক্ত হল, বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ছিন্নমূল হয়ে গেল। এর বলি হতে হলো ইংরেজমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীকে। মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার বিষে নিহত হলেন। সাম্প্রদায়িকতার সেই হোলি খেলা আজও ভারতের রাজনীতিতে প্রবল শক্তি নিয়ে টিকে আছে। যারা ভারতের জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছিল তারা ভারতের ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছে। এর চেয়ে করুণ পরিণতি পরাধীন ভারতের মানুষও হয়ত ভাবতে পারেনি।

পাকিস্তানি প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশি জাতিস্বত্বার উন্মেষ

কলকাতা প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী থাকায় ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতিতে এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ ভারতে নবজাগরণের সূচনা এবং ব্যুৎপত্তি বাংলায় সর্বাধিক প্রতীয়মান হয়। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা এবং তার ক্রমবিকাশ বাংলায় সর্বাধিক মাত্রায় হয়েছিল। সেজন্য বাংলাকে বিভক্ত করে দুর্বল করে দেয়ার চক্রান্ত অতীতকাল থেকেই হয়ে আসছিল। ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই সরকারি প্রজ্ঞাপন (Government Resolution) জারির মধ্য দিয়ে একবার সর্বাধিক প্রচেষ্টা হয়েছিল বাংলাকে পূর্ব বাংলা এবং আসামে বিভক্ত করার।

অবিভক্ত বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা তাঁদের সর্বাধিক মেধা দিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দ্বারা ব্রিটিশদের সে পরিকল্পনাকে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত রোধ করা যায়নি। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করার পূর্বে শেষ পর্যন্ত বাংলায় ভ্রাতৃঘাতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে বাংলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে।

শুরু হলো পূর্ব বাংলা তৎকালীন কথিত পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রায় ঔপনিবেশিক শোষণ। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার যে ঘোষণা মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌সহ পাকিস্তান প্রণেতাদের ছিল তা প্রতিটি পদক্ষেপে মার খেয়েছে কারণ যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তাকে পুঁজিবাদী কায়দায় সংহত করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা আধিপত্যবাদী মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ফেডারেল পদ্ধতির শাসনব্যবস্থার প্রত্যাশার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আধিপত্যবাদী মানসিকতা বারবার টক্কর খেয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে বাংলাদেশী জাতিস্বত্ত্বার উন্মেষ। কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব যে এটিও ধর্মীয় ভাবধারার সাথে আপোষরফা করেই এগিয়ে চলেছে।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে অবশ্যই এই নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত হয়ে যায় যে, বিভক্ত ভারতের দুটি অংশের শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। ফলতঃ ভারত ও পাকিস্তান উভয় অংশে জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়। বুলিসর্বস্ব কিছু বুক্‌নির আড়ালে চলতে থাকলো শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংহতকরণের উদ্যোগ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে যখন পুঁজিবাদের বিস্তৃতি ঘটছে তখন ইউরোপ আমেরিকার উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ তার বিকাশের চরম স্তরে পৌঁছে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে বারবার মহামন্দার সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে পুঁজিবাদ মানেই লুটপাট, ভোগ, দখল, শোষণ, লাঞ্ছনা, অবমাননামূলক একটি সমাজব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রতীয়মান হয়েছে। ভারতে পুঁজির উদ্ভব এবং বিকাশ ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছে এবং পুঁজির দৌরাত্ম ও নিপীড়ন ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে সদ্য রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজিবাদী ধারায় রাষ্ট্রব্যবস্থা এগিয়ে নিতে খুব বেগ পেতে হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকায় ব্রিটিশ শাসনামলেই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় পুঁজিবাদ একচেটিয়া চরিত্র অর্জন করেছিল। আবার রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব দেখে আতঙ্কের কারণে ১৯৪৭ সালে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লব বিরোধী ও আপোষকামী ছিল। এই কারণে শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করেছে তাই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মবাদী সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ও সংস্কৃতির সাথে আপোষ করেছে। তাই বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর আপোষকামী চরিত্রই জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে যা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তীয় অচলায়তনের প্রতি নতজানু ছিল। আবার ভারতের রেনেসাঁ ও ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগোষ্ঠির তেমন সম্পৃক্ততা না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি বুর্জোয়া নেতৃত্ব ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকেও বহুলাংশে আপোষকামী ছিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির চরিত্রে পুঁজিবাদী লুটপাটের সংস্কৃতির পাশাপাশি ছিল সামন্তীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব। ফলে জনসাধারণ অর্থনৈতিক মুক্তির কোনো স্বাদ তো পেলই না এমনকি শোষণ-নিপীড়ণজাত সাংস্কৃতিক সংকট যা ব্রিটিশ শাসনামলে এ উপমহাদেশের জনসাধারণকে পীড়িত করেছে, যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে এদেশের আহত মানুষ বারংবার জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, পাকিস্তানি শোষকদের হাতে সেই একই ধরনের নিবর্তনমূলক আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পুনরায় প্রত্যক্ষ করল।

এ পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল ছাত্রসমাজ সর্বপ্রথম সংগঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন চিত্র ফুটে উঠেছে। এর মূলকথা হলো ব্রিটিশ যেমন ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা বলতে তাদের কাজকর্মের সুবিধার্থে কিছু কেরানি তৈরির কারখানা হিসাবে শিক্ষাকে যতটুকু স্তরে উন্নীত করার প্রয়াস করেছিল ব্রিটিশমুক্ত পাকিস্তানেও নয়া পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থাকে তার থেকেও নামিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। ফলে পূর্ববঙ্গের আন্দোলন-সংগ্রামের সুফলা উর্বর ক্ষেত্রে এদেশের ছাত্র জনতা নীরব দর্শকের মতো বসে থাকেনি। কারণ তারা ইতিমধ্যে ব্রিটিশবিরোধী লড়াই সংগ্রামের ধারায় অর্জন করেছে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ব্রিটিশ ভাবমানস নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাকে গৌণ করে তোলার চক্রান্ত সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। অচিরেই তারা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর তৎকালীন মনোভাব তুলে ধরে বিভিন্ন দাবীদাওয়া ঘোষণা করে। সেসকল দাবিসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এবং তৎকালীন শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিরোধ, পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান, স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সরকারী সাহায্য, শিক্ষায়তনগুলোকে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান, শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করে শিক্ষায়তনগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করা ইত্যাদি। পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের মাধ্যমে উত্থাপিত এসকল দাবী সমগ্র পাকিস্তান আমলে অপূরিত ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও বাংলাদেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পরও তৎকালীন ছাত্রসমাজের এর উত্থাপিত এ সকল দাবি অপূরিত রয়ে গেছে।

ব্রিটিশমুক্ত পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বিতর্ক ওঠে পাকিস্তানের গণপরিষদের বৈঠক ঢাকায় আহ্বানের উপর। বলা হয়েছে যে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ মানুষের বসবাসের স্থল। কাজেই বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণপরিষদ অধিবেশন একটি ন্যায়সংগত দাবি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে এবং স্বৈরাচারী কায়দায় পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার দাবি-দাওয়াকে অস্বীকার এবং অবহেলা করছিল। আক্রমণ নেমে আসে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা প্রবর্তনের উপর। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্র কৃত্রিম বিভাজনের মধ্য দিয়ে বিস্তর ভৌগলিক ব্যবধানে

সৃষ্ট হতে যাচ্ছে সেকারণে শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি হত্যা করা এবং জাতিগত নিপীড়ন চালানোর মানসিকতা থেকেই কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা ছিলনা। এটি মূলত একটি ভারতীয় ভাষা যা ভারত উপমহাদেশে শহুরে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় এবং শিক্ষিত হিন্দুরা সাহিত্যে ব্যবহার করত। সেকারণে অবিভক্ত পাকিস্তানে অতি স্বল্পসংখ্যক লোক যারা মূলত ভারত থেকে পাকিস্তানে ভারত বিভাগের সময় স্থানান্তরিত হয়েছিল তারা উর্দুতে কথা বলত। এদের মধ্যে ভারত থেকে আসা শিল্পপতি ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারাও ছিল। অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষা ছিল। গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি মেনে চলার মানসিকতা থাকলে অল্প কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার ধ্যানধারণা ও চক্রান্ত পাকিস্তান গঠনের আগে থেকে হওয়া সম্ভব ছিলনা। এমনকি ব্রিটিশ আমলের কারেন্সি নোটে বাংলা ভাষার স্থান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশমুক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অনুভূতির তোয়াক্কা না করে কারেন্সি নোট থেকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তা তুলে দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভূক্তকরণের প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। গণপরিষদের সদস্যরা যেমন কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) বাংলা ভাষার সপক্ষে এ যুক্তি তুলে ধরেন যে পূর্ব বাংলা সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে অন্যতম একটি প্রদেশ হওয়ার পরও নিখিল পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাই ডমিনিয়নের ধারণা এবং গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নিখিল পাকিস্তান গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার পাকিস্তান প্রণেতাদের ছিল তা মেনে চলতে গেলে বাংলাকে পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে চালু করতে হবে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করার সপক্ষে এহেন জোরালো যুক্তি থাকার পরও ক্ষমতার জোরে স্পীকার এ প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। কাজেই ফেডারেল পদ্ধতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে তোলার ভণিতা আর মিথ্যাচার উন্মোচিত হয়ে পড়ায় সেসকল ধারণা পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই কবরস্থ হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ভাষা আন্দোলনের উপর পুলিশি আক্রমণ। আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে হরতাল আহ্বান করে। ব্রিটিশমুক্ত ভূখণ্ডে ছাত্র যুবসমাজ প্রাণের দাবিতে কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে পুনরায় পুলিশ দ্বারা নির্যাতিত হলো ব্রিটিশ তাড়ানোর প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই।

১৯৪৮ সালের ১ মার্চ গণপরিষদ সভায় পাকিস্তানের প্রথম বাজেট নিয়ে বিতর্ক ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাত মাসের মধ্যেই প্রথম বাজেট অধিবেশনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান সরকার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং ধণিকশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণকারী হিসাবে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি গণপরিষদ বা আইনসভায় বাজেট পেশ করেননি। যিনি আইনসভায় বাজেট পেশ করেছিলেন তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেলের মনোনীত ব্যক্তি। বাস্তবিক অর্থে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যারা হাল ধরেছিল তারা পাকিস্তানি শিল্পপতিদের আস্থাভাজন একটি অভিজাত সম্প্রদায় যাদের দায়বদ্ধতা পাকিস্তানের জনসাধারণের চেয়েও পাকিস্তানি পুঁজিবাদ এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছেই অধিক ছিল। যার ফলে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাজেটে সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে বিপর্যস্ত পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আরো বড় ধরণের বিপর্যয় নামিয়ে নিয়ে আসে। গরিব মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপকরণসমূহের উপর এই বাজেটে উচ্চ কর আরোপ করা হয়। এই বাজেটে পূর্ব বাংলায় শিল্প বিকাশের উপর কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অপরদিকে এই বাজেটে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কথা বলে সামরিক খাতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে পাকিস্তানের প্রথম বাজেটেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে।

যদিও গভর্নর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ধারণা উদাহরণ হিসাবে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন কিন্তু রাষ্ট্রনায়কোচিত চরিত্রের দিক থেকে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ আর মার্কিন ব্যবস্থার পত্তনকারী জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন অথবা আব্রাহাম লিংকন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন। ফেডারেল পদ্ধতিতে যা মৌলিক তা হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা। ফেডারেল পদ্ধতিতে জমির উপর খাজনা প্রাদেশিক সরকারের অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এই বাজেটে সে অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রদেশগুলো কেবলমাত্র কালেক্টরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ট্যাক্স সংগ্রহ করে তা কেন্দ্রকে পাঠাবে। এভাবে প্রথম বাজেটেই প্রদেশগুলোর স্বায়ত্বশাসন বলবৎ করার মধ্য দিয়ে ফেডারেল পদ্ধতিতে পাকিস্তান পরিচালনার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল তার মর্মে আঘাত করা হয়েছিল। শিল্পপতি, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী ও মন্ত্রী-আমলাদের কোটি কোটি টাকার সেস্ (কর) অনাদায়ী থেকে গেছে কিন্তু গরীব কৃষক কৃষি ঋণ শোধ দিতে না পারার কারণে বাড়ীঘর নিলাম ও জমি ক্রোক করে ঐ ঋণ আদায়ে বাধ্য করা হয়েছে। এসব নিয়ে মওলানা ভাসানী বিধান সভায় জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেই ১৯৪৮ সালেই। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের নামে জমিদারদের মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ এবং জোতদারদের ২০০ বিঘা জমি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ভূমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ পর্ব চলতে থাকে। এসকল পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নবগঠিত পাকিস্তানি শাসক রাজনৈতিকভাবে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক আর অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানের উদীয়মান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষা ও পালনকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেই পুঁজিপতিদের অধিকাংশ কলকারখানা ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে কাঁচামাল সরবরাহ, ইজারা আদায়ের ক্ষেত্র এবং পণ্য বিক্রির বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হত। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের প্রায় উপনিবেশিক আধিপত্য কায়েম করা হয়। তাছাড়া ১৫০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত উভয় অংশের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত কোন মিলও ছিল না। নিছক ধর্মীয় আবেগে ভৌগলিক সংলগ্নতাহীন, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান একটি জাতি গঠন ও টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে নয় দিন অতিবাহিত করেন তখন তিনি যেসকল বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানের তথা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে বিবর্ণ অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন যা পাকিস্তান গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল সে বিষয়ে কোন আলোকপাত তো করলেনই না বরং তার বক্তব্যে ছিল ভয়ভীতি প্রদর্শন। কেন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিজেদের বাঙালি অস্তিত্বকে একেবারে মুছে ফেলতে পারছে না তা নিয়ে তিনি চূড়ান্ত বিরক্তি আর ক্রোধ প্রকাশ করেন। সমগ্র বক্তৃতা সেসকল জবরদস্তিতে ভরপুর ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেন যে, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকারের রেখে যাওয়া কেরানি তৈরির কারখানা। এটি আরো সত্য হয়ে উঠবে যখন ছাত্ররা পাশ করে সরকারের কাছে চাকুরী প্রত্যাশা করবে। কাজেই কেউ যদি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হয় তাহলে সরকারের কাছে চাকুরী প্রত্যাশা না করে যেন নিজেরাই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কায়দে আযম বা জাতির পিতার মুখে এ নিয়ে কোনো বক্তব্য শোনা গেলনা যে নবগঠিত একটি দেশের মেরুদণ্ড শিক্ষক যখন ১০-১৫ টাকা বেতন পান তখন সরকারী মন্ত্রী, এম.পি আমলাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার সুযোগ-সুবিধা কেন রাখা হবে, কিভাবে একজন শিক্ষক ১০-১৫ টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর যে ছাঁটাই এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংসের যে প্রক্রিয়া চলছিল তিনি তা নিয়েও কোনো বক্তৃতা রাখলেন না। উপরন্তু সেসময়ে পূর্ব বাংলায় যারা এসকল ইস্যুতে আন্দোলন করছিলেন তাদের জিন্নাহ পাকিস্তানের শত্রু, কমিউনিস্ট, ভারতের চর হিসাবে অভিহিত করে তাদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে বাড়াবাড়ি তিনি একেবারেই বরদাস্ত করবেন না। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য তিনি মনে করেন উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে অবশ্য বিদায়ী ভাষণে 'কায়দে আযম' মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ গুটি কয়েক সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন ও অপরাপর সুযোগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দিতে ভুললেননা।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির কতটা অবনমন ঘটে তার সাক্ষাত মেলে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে। এ পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কবর দেওয়া হইয়াছে। সভা সমিতির অধিকার হরণ, বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং অর্ডিন্যান্স রাজের স্টীমরোলার আজ পাকিস্তানে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...স্বাধীন পাকিস্তানে খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র এবং সুখী জীবনের পরিবর্তে নূতন দাসত্ব এবং অনাহারের শৃংখলে জনগণ শৃংখলিত হইতেছে। ... মুষ্টিমেয় লোক অগণিত জনসাধারণকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করিতেছে। মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীর স্বার্থকে পাকিস্তান এবং ইসলামের স্বার্থ বলিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইতেছে। পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি আজ মেহনতকারী মানুষের বিরুদ্ধে নির্ধারিত হইতেছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে ধনিক দাসত্বই জনগণের জীবনে চরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

১৯৪৮ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানী-কে সভাপতি এবং শামসুল হক-কে সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে সহ-সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন শামসুল হক কর্তৃক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ঘোষণাপত্রে আশু কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়, কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী প্রথার বিলোপ এবং জমির মালিকানা কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়া, প্রধান শিল্প-কারখানাসমূহের জাতীয়করণ, সরকারি উদ্যোগে নতুন কলকারখানা সৃষ্টি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাকে পুনর্গঠিত করা, প্রশাসনকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে রক্ষা করা, স্বর্ণালী তন্তু হিসাবে পাটের সম্ভাবনাকে প্রদেশের উন্নয়নের কাজে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা এবং পাটের পর্যাপ্ত শিল্প গড়ে তোলা প্রভৃতি।

এসময়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিও পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিলরগণ সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। একটি পৃথক সভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিলরদের নিয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। একই দিনে খোকা রায়কে সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অপরিসীম ত্যাগ, পুলিশি নির্যাতন, কারাগার বরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাচোল বিদ্রোহ সংগঠিত করে। নাচোল বিদ্রোহ আজও বাংলার কৃষক আন্দোলনে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহীর কেন্দ্রীয় খাপড়া জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। এর ফলে সাতজন মারা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িয়ে পড়ে যা রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র হিসাবে পরিচিত হয়। এ ঘটনার জন্য ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রায় সমগ্র পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকে। ফলে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অংশ হিসাবে কাজ করে। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় কংগ্রেস করতে সক্ষম হয় ১৯৬৮ সালে। এই দীর্ঘ সময়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বৈরশাসকদের পুঁজিবাদ-সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টভিত্তিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে বুর্জোয়া দলগুলোর মধ্যে মিশে গিয়ে তাদেরই প্রাধান্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করতে থাকে এবং যার ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে পুঁজিবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের সহায়ক শক্তি হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়।

ঘটনাবহুল '৫০ এর দশক এবং উত্তাল গণআন্দোলন

১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যে তিনি পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেন। এর অংশ হিসাবে তিনি প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। এ বিষয়ে তার অকাট্য যুক্তি হলো যেহেতু ইসলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই তাই সে রাষ্ট্রে প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলেনা। কাজেই প্রাদেশিকতাকে যারা প্রশ্রয় দেয় তারা পাকিস্তানের শত্রু। একই বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দূ করার ঘোষণা দেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার ছাত্র, জনতা বিশ্বঘাতকতা হিসাবে আখ্যায়িত করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদী আত্মদান করে। সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেকে। এই আন্দোলন একটি মাইলফলক। সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে যে দেশ গড়ে উঠেছিল, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেখানে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার দ্বার উন্মোচিত হলো।এরপর শুরু হয় যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির পর্ব। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবিনামায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, পাট ও লবণ শিল্পের জাতীয়করণ, সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি, কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন সাধনের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ করা এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তিপ্রদান ও সংবাদপত্র এবং সভা-সমিতির অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সার্বভৌম নিশ্চিত করা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। ২১ দফা দাবিসমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এসকল দাবিসমূহে প্রধানত উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর দাবি-দাওয়া প্রাধান্য নিয়ে ছিল, কিন্তু বিদেশি শোষণের এই স্তরে জনগণের দাবিও এর মধ্যে মিলেমিশে ছিল। যার কারণে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ এ দাবির সাথে সম্পৃক্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরপরই তা মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার পুস্তিকায় তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। এ প্রচার পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয় যে, তৎকালীন সরকার মুসলিম লীগের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করে জালিম শাহীর রাজত্ব কায়েম করেছে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন, বিদেশের দূতাবাসে মদের প্লাবন, ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়া, পাকিস্তানকে দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরও শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গড়িমসি, ব্যক্তিস্বাধীনতার জলাঞ্জলি, খুনীর ভূমিকায় মুসলিম লীগ, খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হতে জনগণকে বঞ্চিত করা, তীব্র লবণ সংকট, রোগীর পথ্য ও ঔষধের অব্যবস্থা, শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ, জমিদারী প্রথা বিলোপের ভাঁওতা, পাট কেলেঙ্কারী, করভারে দরিদ্র চাষীকে পীড়িত করা, বিচার বিক্রয়, মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যুক্তফ্রন্ট প্রণীত ২১ দফা দাবীনামায় বাঙালি জাতির স্বার্থের সপক্ষে মৌলিক কিছু দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হওয়ায় এর ভিত্তিতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে নির্বাচনে বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ক্রমাগত অধঃপতিত হতে থাকে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ কেন্দ্রীয় গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করে আমলা ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গোলাম মোহাম্মাদ নিজেও একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। তাঁর এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় যে সামরিক, বেসামরিক আমলা এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ শুরু হল আজ পর্যন্ত সেই বর্বর হস্তক্ষেপের অবসান হয়নি। পুনরায় পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১ জুন প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় এবং ৭ জুন যুক্তফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের সামরিক পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মাদ আলী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জনাব ইস্কান্দার মির্জা নানা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরান। ফলে আওয়ামী লীগকে ছাড়াই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে বাধ্য হয়।

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদে পুনরায় শাসনতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। মওলানা ভাসানী এক প্রতিক্রিয়ায় এ শাসনতন্ত্রকে পাকিস্তানের সাত কোটি জনসাধারণকে দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, বিগত আট বৎসরে কেন্দ্রের শাসনে পূর্ব বাংলার মানুষ ক্রমাগত সম্পদ হারিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়েছে, বেকারত্ব বেড়েছে, শিক্ষিত যুবক রোজগার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। কৃষক শ্রমিক রোজগারের অভাবে বাড়িঘর বিক্রি করছে, এমনকি তারা একসাথে দশ সের চাল কেনার সামর্থ হারিয়েছে। তিনি কেন্দ্রের হাতে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যেমন সেলট্যাক্স, সুপারি, তামাক ও পাটের উপর ট্যাক্স ও পার্সেজ ডিউটি কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিকে অচল করে দেয়ার চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। এক বিতর্কে পূর্ব বাংলার অর্থনীতির ভগ্ন দশা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয় যে, ১৯৪৭-'৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় রাজস্বে ২৬ শতাংশ অবদান রাখত যা বিভিন্ন বছরগুলোতে কমে ১৯৪৯-'৫০ সালে ২৬ শতাংশ, ১৯৫০-'৫১ সালে ২৪.৭ শতাংশ, ১৯৫২-'৫৩ সালে ২০.৮ শতাংশ, ১৯৫৩-'৫৪ সালে ১৯.৪ শতাংশ, ১৯৫৪-'৫৫ সালে ১৪.৭ শতাংশ এবং ১৯৫৫-'৫৬ সালে ১২.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে উন্মোচিত হয় যে কেন্দ্র শাসন কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে নিংড়ে নিচ্ছে। তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার সদস্যগণ শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবি করেন। কিন্তু পাকিস্তানী জান্তা কোন যুক্তি তর্কের তোয়াক্কা না করে ১৯৫৬ সালে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে যাতে কেন্দ্রের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ১৯৫৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানীর এ সরকার গঠনের বিষয়ে আপত্তি ছিল। তাঁর মতে যতদিন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্য বরাদ্দ না দেবে

ততদিন পূর্ব বাংলায় সরকারের দায়িত্ব আওয়ামী লীগ এর নেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ এর অপরাপর নেতৃত্ব সরকার গঠনের পক্ষে থাকায় জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করে।

এরপর ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি বাঙালির ইতিহাসে এক গৌরবজ্জোল অধ্যায়। বাঙালির প্রাণপুরুষ জননেতা মওলানা ভাসানীর আহ্বানে এ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সম্মেলনে জনতার ঢল নেমেছিল। মওলানা ভাসানীর নামে এ প্রচারপত্রে ছয়টি দাবি তুলে ধরা হয়, সেগুলো হল, সাড়ে চার কোটি বাঙালির বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক, ঐতিহাসিক ২১ দফা আদায়, চাষী, মজুর, কামার, কুমার, বুদ্ধিজীবি ও শিল্পী সকল শ্রেণীর মিলন, সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তি, পূর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করা এবং ২১ দফাকে পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির সনদ হিসাবে পূর্ণ রূপায়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এছাড়াও এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সমগ্র যুদ্ধ জোট যেমন বাগদাদ, সিয়াটো ইত্যাদির প্রবল বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে স্বয়ং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তিনি মওলানা ভাসানীর স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে আমরা শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছি আর পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে বলেন যে পররাষ্ট্রনীতি কখনই স্থিতিশীল হতে পারে না। হোসেন শহীদ সোহ্‌রোওয়ার্দীর এধরনের বক্তব্য তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এসময়ে আওয়ামী লীগ এর এক কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের মূল রাজনৈতিক ধারা থেকে বিচ্যুতির সম্ভাব্যতায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ে একদিন তিনি এবং তার সম্মুখে উপস্থিত সকলেই মুসলিম লীগ করতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন মুসলিম লীগ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দেবে। কিন্তু সেই মুসলিম লীগ কেন সর্বজন পরিত্যাজ্য হয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে এলো তা বলতে গিয়ে মওলানা ভাসানী যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো, ক্ষমতা তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল ফলে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে তোয়াক্কা না করে রাজধানী করাচীতে নিয়ে যাওয়া আর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়া, ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থে রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা, বিরোধী দল মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারে থেকে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের ধন ও সম্পদ নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন, শাসকগোষ্ঠীর মুর্খতার সাথে আত্মম্ভরিতার সংমিশ্রণ, রাজনীতির সাথে অর্থনীতি মিশিয়ে অর্থনীতির নিয়ম খেলাফ করে শক্তিশালী ভারত, চীন এবং রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যের সম্পর্কের অবনমন, ইংরেজ আমল অপেক্ষাও মাথাভারী প্রশাসন ইত্যাদি। এভাবে ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় দেখানো হয় যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির বৈষম্য।

মওলানা ভাসানীর সাথে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগের নেতাদের মতপার্থক্য ক্রমাগত তীব্র হতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অভ্যুদয় ঘটে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান পারমানবিক অস্ত্র কর্মসূচি জোরদার করা সহ পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংশীদার হওয়াকে সঠিক মনে করতেন আর অপরদিকে মওলানা ভাসানী ছিলেন সকল প্রকার যুদ্ধ পরিকল্পনা ও জোটের বিরোধী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ বিরোধ বিভাজনের দিকে নিয়ে গেল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চের সংবিধান স্থগিত (abrogated) থাকবে, কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বরখাস্ত হবে, জাতীয় সংসদ ও কেন্দ্রীয় বিধানসভা বিলুপ্ত হবে, সকল রাজনৈতিক দল বন্ধ করতে হবে, বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক আইনের অধীন হবে এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে করা হবে প্রধান সামরিক প্রশাসক। এর মধ্যেই জেনারেল আইয়ুব খান জোর করে ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এভাবে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সিভিল রুল অপসারিত হয়। এরপর সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা উত্তাল আন্দোলনে লিপ্ত হয়।

’৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন এবং ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

এধরনের প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পতন অনিবার্য করে তোলে। এছাড়াও ১৯৬৪ সালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠার সময়ে সামরিক জান্তা জেনারেল আইয়ুব খান তাঁর পূর্বসুরীদের মতোই অবিভক্ত পাকিস্তানের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করতে থাকে। আবার যেহেতু মুষ্টিমেয় কয়েক জন বড় ধনিক যেমন, ইস্পাহানী, আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ, সায়গল সকলেই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানি তাই সমগ্র পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা পশ্চিম পাকিস্তানি ধনিক শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেয়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণের যে প্রক্রিয়া চলছিল তা আইয়ুব আমলে আরও তীব্রতর হয়। এসকল কোম্পানির মুনাফার হার ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ২০০-৩০০ ভাগ। অথচ অপরদিকে সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমিকদের জীর্ণশীর্ণ প্রায় বুভুক্ষু অবস্থা। এদিকে আবার অল্প কিছু বড় ব্যবসায়ী সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ফাটকাবাজের মাধ্যমে বাজারের কারসাজি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। জমির সিলিং গণবিরোধী আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ১০০ বিঘা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘা করে। ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দৌরাত্ম্যও আইয়ুব আমলে ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ কোটি টাকা যার সুদ ছিল বছরে ৫০ কোটি টাকা।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সালের আন্দোলন যা শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নজির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক জান্তা আইয়ুব খান একজন সরকারি আমলা তৎকালীন শিক্ষা সচিব

এস এম শরীফকে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কোনো শিক্ষাবিদকে দিয়ে তিনি এ শিক্ষা কমিশন গঠন করেননি। স্বভাবতই আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়ে ওঠা এ শিক্ষানীতি ছাত্রসমাজসহ শিক্ষানুরাগী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে মারাত্মক সাংঘর্ষিক ছিল। ধারাবাহিক এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতি নিয়ে তৎকালীন শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় শিক্ষানুরাগী ছাত্রসমাজ আর মিলিটারি ডিকটেটর জেনারেল আইয়ুব খান। শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতি নিয়ে ছাত্রসমাজের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো এ শিক্ষানীতিতে পূর্বতন ব্রিটিশদের শিক্ষা সংকোচন এবং শিক্ষাকে কিছু কেরানি তৈরীর মাধ্যম অথবা যন্ত্রের বর্ধিত অংশ হিসাবে যন্ত্রের অধীন কিছু মানুষ যারা বৃত্তিমূলক কাজকর্ম করবে সেভাবে ছাত্র সমাজকে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে নানা সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল : (১) উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা, (২) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, (৩) আরবি হরফের প্রসার ঘটানো, (৪) শিক্ষাকে একেবারেই সহজলভ্য করে না তোলা, (৫) শিল্প এবং শিক্ষাকে একইভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা, (৬) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণাকে কাল্পনিক জ্ঞান করা, (৭) ডিগ্রি কোর্স দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা প্রভৃতি। এই সর্বনাশা সুপারিশসম্বলিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সেসময়ের পূর্ববাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ অত্যন্ত সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতালের আহ্বান করেন। এ হরতালকে মোকাবিলা করতে বর্বর আইয়ুবশাহী পুলিশ, ইপিআর, আর্মিসহ সকল পেটোয়া বাহিনীকে নিরস্ত্র ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এ সংগ্রামে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ্ শহীদী মৃত্যুবরণ করেন। মেডিকেল কলেজগুলোতে রক্তাক্ত ছাত্রদের ভীড়ে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। অথচ ছাত্রসমাজের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে কুচক্রী আইয়ুব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক আমলাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে 'ভাড়া খাটা' বলে আখ্যায়িত করায় সচেষ্ট ছিল। গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের আহ্বানে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিন ব্যাপী সারা প্রদেশে শোক দিবস পালন করা হয়। উল্লেখ্য, এই গুলি ও নির্যাতনের মুখে পরদিনও পূর্ব বাংলায় হরতাল পালন করা হয়। উল্লেখ্য ছাত্রসমাজ শিক্ষাদিবসের চেতনায় আজও এ দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে – "শিক্ষা আমার অধিকার, এ অধিকার সবার চাই"। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সরকারসমূহ ব্রিটিশ-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীদের মতোই শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যকরণের পক্ষে একাত্ম। বাঙালির শিক্ষা অনুরাগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হাজির করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা কমিশনের প্রধানগণ এস. এম. শরীফ বা হামদুর রহমানের ভাষাতেই শিক্ষানীতি বহাল রেখেছে। এ থেকে বোঝা যায় শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শাসক দেশি হোক বা বিদেশি হোক একই চরিত্র ধারণ করেন।

এরপর ধারাবাহিকভাবে অভূতপূর্ব সব আন্দোলনের কর্মসূচি চলতে থাকে যার মধ্যে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স (১৯৬৩) এর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের অভূতপূর্ব হরতাল কর্মসূচি সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরল ছিল। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল সেসময়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাঝে গণতন্ত্রমনা মানুষের অশেষ ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা। ১৯৬৪ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য প্রদেশব্যাপী সভা, শোভাযাত্রা ও হরতাল পালন করা হয়। ১৯৬৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে স্বৈরাচারী আইয়ুবের বিরুদ্ধে অন্য কোনো বিকল্প না থাকায় বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনীত করা হয়। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ভোটদানের জন্য কৃষক-জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীসহ তৎকালীন জাতীয় নেতারা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান।

এরপর ৪-৭ জুন ১৯৬৫-তে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ১৪ দফা জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি গৃহিত হয়। এসকল দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ : (১) তৎকালীন আইন পরিষদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন আইন পরিষদ নির্বাচন করতে হবে, (২) পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, (৩) রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে, (৪) পাকিস্তানকে সিয়াটো ও সেন্টো থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে। পাকিস্তানে সকল মার্কিন ঘাঁটির বিলোপ সাধন করতে হবে, (৫) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে হবে, (৬) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার বন্ধ করতে হবে। জনসাধারণকে শোষণের এবং গুটিকয়েক পরিবার কর্তৃক দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে বন্ধ করতে হবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিল্পগুলি সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (৭) দেশরক্ষা শিল্প সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং তা উভয় দেশে স্থাপন করতে হবে, (৮) আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করতে হবে, (৯) ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির পরিমান পূর্ব পাকিস্তানে ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সরকারের খাস জমির মঞ্জুরী অথবা হস্তান্তর শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, (১০) শ্রমিক সংগঠনের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে এবং আই.এল.ও কনভেনশনে যে সকল অধিকার স্বীকার করা হয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। জনসাধারণের নূন্যতম মজুরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, (১১) সকল স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে একটি নূতন গণতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ করতে হবে, (১২) বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান ঘটাতে হবে, (১৩) পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, (১৪) সাধারণ মানুষের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাসের জন্য কর ধার্য করার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

এর ঠিক কয়েক মাস পরেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দফাগুলো হল : (১) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়ে তুলতে হবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে। (২) ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় এই দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমুহের হাতে থাকবে। (৩) এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছেঃ (ক) পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে অথবা (খ) দুই অঞ্চলের একই কারেন্সী থাকবে তবে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার রোধের জন্য আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক চালু থাকবে। (৪) সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে, (৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা হল, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে; দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলবে; দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিষয়ে এখতিয়ার বলবৎ থাকবে; (৬) পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী বাহিনী থাকবে।

মওলানা ভাসানী প্রণীত ১৪ দফা এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মওলানা ভাসানী প্রণীত ১৪ দফা দাবিসমূহের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬ দফার মৌল নীতিসমূহ স্থান তো পেয়েছেই কিন্তু তার সাথে সাথে আবার ১৪ দফায় শ্রমিক-কৃষক ও মজলুম জনগণের অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিসমূহও স্থান পেয়েছে যা আবার ৬ দফায় অনুপস্থিত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যে অনুপস্থিতি তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়ারা যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি শ্রেণীর লুণ্ঠনের মুখে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল ৬ দফায় কেবলমাত্র সেই বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষাটুকুই স্থান পেয়েছিল। যেহেতু সেসময়ে সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের প্রায় ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব, যেহেতু এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল পূর্ব বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী, তাই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে সম্ভাব্য নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হতে যাচ্ছিল তার নেতৃত্বে তাঁরাই ছিলেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়ারা জাতীয় বুর্জোয়া হিসাবে আবির্ভূত হল। এই দ্বন্দ্বই তৎকালীন সমাজে প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সেকারণে প্রচার-প্রচারণায় এমনকি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও দর কষাকষির পয়েন্ট হিসাবে ৬ দফাকেই বেছে নিয়েছে। এভাবে ৬ দফা প্রণয়নের পূর্বে পর্যন্ত যদিও মওলানা ভাসানীই প্রধানত আন্দোলন-সংগ্রামের এক বিশাল প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন কিন্তু এসময়ে পূর্ব বাংলার উঠতি বুর্জোয়ারা শেখ মুজিবর রহমানকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নেয়। পশ্চিম পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের কাছেও সংগ্রামী ধারার দুর্বলতার কারণে শেখ মুজিবর রহমান মওলানা ভাসানীর থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ৬ দফার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান এর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ পরিস্থিতিতে যদি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক ঠিক ভাবে তৎকালীন শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়কে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারতো তবে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব এভাবে পিছিয়ে পড়তো না এবং এই বিপ্লব হয়তো ইতিহাসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেসময়ে কমিউনিস্টরা মনি সিংহের নেতৃত্বে মস্কোপন্থী এবং মোহাম্মাদ তোয়াহার নেতৃত্বে পিকিংপন্থী এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মস্কোপন্থী অংশটি পরবর্তীতে শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা দাবিকে সমর্থন করে যদিও চীনপন্থী অংশটি প্রধানতঃ ভাসানীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। পশ্চিম বাংলায় নকশালপন্থীরা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে যে উগ্রপন্থী রাজনীতি করে তার প্রভাব পূর্ব বাংলায় চীনপন্থী কমিউনিস্টদের উপর পড়ে। সেই ধারার একটি অংশ 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে অন্ধভাবে চীনকে অনুসরণ করেছে। মস্কোপন্থীদের অধনবাদী বিকাশের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্রুশ্চেভীয় তত্ত্বের যোগসূত্র, চীনপন্থীদের মাও চিন্তাধারা ও মাওবাদ নিয়ে তালগোল, চারু মজুমদারের লাইন, শ্রেণীশত্রু ও ব্যক্তিহত্যার লাইন, দুই লাইনের সংগ্রামের ভ্রান্তি, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যার ভ্রান্তি, অবৈরি দ্বন্দ্ব এবং একাত্মতার সংগ্রাম প্রসঙ্গে ভ্রান্তি প্রভৃতি বিচ্যুতি বাম রাজনীতিকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলে। সেই সময় যে বাম রাজনীতি দুর্বল হলো এর ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাম রাজনীতি একটি দুর্বল ধারা।

যাই হোক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়তে হয়েছে আর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের শোষণের নিগড় টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগ আহুত এক হরতালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে ১১ জন মানুষ নিহত ও অগণিত মানুষ আহত হয়। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। নিরস্ত্র জনতাকে শায়েস্তা করার জন্য সামরিক ট্রায়েল বসানোর মধ্য দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। সরকারি প্রেস নোটে আন্দোলনকারীদের ছোকরা ও গুন্ডা বলে অভিহিত করা হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে স্পীকার আব্দুল জব্বার খান গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণ করবেন না বলে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। এ পর্যায়ে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ জুন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল করা হয় এবং এ পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।

চলমান এ সকল ঘটনাপুঞ্জের মাঝেই স্বল্প পরিসরে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম হয়। যদিও সমগ্র পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন মূলত একদিকে যেমন রাজনৈতিক অপরদিকে তা আবার সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বটে। কারণ সে লড়াইয়ের মধ্যে বাঙালীকে ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রবল পরাক্রমশালী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি মূহূর্তে লড়তে হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালীর রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করল। মওলানা ভাসানীসহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এসময়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে এ পদক্ষেপের নিন্দা করেছিলেন। মওলানা ভাসানী এসময়ে বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদান তুলে ধরে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের অবদান সার্বজনীন। তিনি

দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানান। ছাত্রসমাজ সেসময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গলায় হারমোনিয়াম বেধে রাজপথে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে এর মর্যাদা রক্ষা করেছিল। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রবীন্দ্রসংগীত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। এসময়েই বিচারপতি হামিদুর রহমান লাহোরে পাকিস্তান কাউন্সিলে আরবি হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেন যা বাঙালি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই পাঁচদিনব্যাপী পাঁচ মহাকবির স্মরণে স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ৫ জুলাই রবীন্দ্র দিবস, ৬ জুলাই ইকবাল দিবস, ৭ জুলাই গালিব দিবস, ৮ জুলাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং ৯ জুলাই নজরুল দিবস পালিত হয়। এধরনের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন ষাটের দশকের শেষার্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে।

এরপর শুরু হয় আইয়ুব বিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট যা ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের পতন ঘটায়। ১৯৬৮ সালে ২৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর কাছে ঐক্যের প্রস্তাব রাখেন ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী। মওলানা ভাসানী বলেন যে তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য এর পূর্বেও প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তিনি সর্বদা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে। ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্যে তিনি বলেন যে তাঁর দল কখনই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিরোধী নন, কিন্তু তিনি নির্বাচনী ঐক্যের বিরুদ্ধে। ১৯৬৮ সালের ২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের একটি দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলকারীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিল, নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক ছাপাখানার বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে গভর্নর হাউজের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮-তে বিরোধী দলসমূহের আহ্বানে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এ ধর্মঘটে পুলিশ শত শত আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ আহ্বান করে ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এই ১১ দফা দাবিসমূহ বাস্তবে পূর্বতন ছাত্রসমাজ, মওলানা ভাসানী প্রণীত ১৪ দফা এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬ দফা দাবিসমূহের সংকলন। এটি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতির চূড়ান্ত আহ্বান। এরপর থেকে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল সমাবেশ করতে গিয়ে ছাত্র-পুলিশ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় এবং ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান শহীদ হন। পুলিশ আসাদের মরদেহ ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল কিন্তু ছাত্ররা সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে শহীদ আসাদের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা ছাত্রসমাজের সকল কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এরপর থেকে উত্তাল ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন আর থেমে থাকেনি, অবিশ্রান্তভাবে তা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত চলতেই থাকে। ১৯৬৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে ছাত্রসমাজ আহুত ১৪ ফেব্রুয়ারির হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু, ১৭ ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর চরমপত্র, ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইন এবং ফলত ড. শামসুজ্জোহা নিহতসহ আরও ৬ জন অধ্যাপক হতাহত আইয়ুবের লৌহশাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবর রহমানসহ অপরাপর অভিযুক্তরা তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। উক্ত বৈঠকে তিনি পুনরায় ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামীলীগের ৬ দফার গুরুত্ব তুলে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে পাকিস্তানের বিভক্তি ঠেকানোর জন্যই এ দাবিগুলো পূরণ করা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আইয়ুব খান ১৪ মার্চ ১৯৬৯ এ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন এবং পার্লামেন্টারি শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোলটেবিল বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি। আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনগণের অবশিষ্ট দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর বক্তৃতায় শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ধূর্ত আইয়ুব খান ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শক্তি বুঝতে পেরে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের নিকট উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি দায়িত্ব থেকে সরে যান।

এভাবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে অপর এক অত্যাচারী শাসক, যে কিনা পরবর্তীতে বাঙালির রক্তে হোলিখেলায় মেতে উঠেছিল সেই ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ এর সরকার গঠন নিয়ে টালবাহানা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ২রা মার্চ থেকে অব্যাহত ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালীর উপর সামরিক আক্রমণ করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট এবং তাকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাওলানা ভাসানীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব থাকার পরও বামপন্থীদের পরামর্শ এবং তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এর প্রভাব পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। সমগ্র পাকিস্তান আমলের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাওলানা ভাসানীর যে গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছিল তাতে তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল জাতিকে গ্যালভানাইজ করা এবং তার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম বা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গড়ে তোলা। সমস্ত আন্দোলন একটি যুক্তফ্রন্টের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলো না। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শলাপরামর্শের মাধ্যমে যথার্থ পথে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। এ ব্যাপারে বামপন্থী নেতারা ভাসানীকে কোনো গাইডলাইন দিতে পারেননি। তাই ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। মাওলানা

ভাসানীর নেতৃত্বকে সামনে আনার জন্য বামপন্থীদের যে সচেতন, সযত্ন প্রয়াস আবশ্যক ছিল তার অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্ব দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সন্ধিক্ষণে পিছিয়ে পড়ল।

১৯৭১ সালের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ

শুরু হলো ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের স্বাধীনতাযুদ্ধ মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই। অসীম সাহসিকতার সাথে যৌবনের শক্তি নিয়ে বাংলার বীর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা "The Proclamation of Independence" প্রকাশ করা হয়। এ ঘোষণায় শেখ মুজিবর রহমানকে প্রেসিডেন্ট, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানে বন্দি থাকায় এ ঘোষণায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। নয় মাস ধরে চলল জনযুদ্ধ যা গেরিলা যুদ্ধের রূপে জনগণের লড়াই। কিছু রাজাকার ও পাকিস্তানপন্থী মানুষ ছাড়া পুরো বাংলাদেশের জনগণই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।

যে কোনো আক্রমণে আক্রান্ত জাতির নারীসমাজ সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত হয়। কারণ জাতিগত আক্রমণের মধ্যে যে অপমানবোধ, নারীদের উপর আক্রমণে তা অত্যন্ত তীব্রভাবে থাকে। সেকারণে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমরবিদ্যায় নারীকে আক্রান্ত করা যুদ্ধ কৌশলেরই একটি অঙ্গ। ১৯৭১ সালে এ দেশের নারীসমাজের উপর বর্বর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল। স্বাধীনতাবিরোধীরা এদেশের নারীসমাজকে 'গণিমতের মাল' হিসাবে চিহ্নিত করে সামান্যতম সহানুভূতি দেখায়নি। সেনাক্যাম্পে মা-বোনদের তুলে দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি আক্রমণ করে বাড়ির বধূ, তরুণী, কিশোরীদের উপর অত্যাচার করেছে। মায়ের কোল থেকে সন্তান পড়ে কেঁদে উঠলে বেয়নেট চার্জ করে সেই শিশুর কান্না চিরতরে থামিয়ে দিয়ে সেই মাকে গণধর্ষণ করেছে। সেই মা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করেছে। নারীরা যত আক্রান্ত হয়েছে জনগণের মধ্যে পাকিস্তানিদের উপর ঘৃণার তীব্রতা বেড়েছে, মুক্তির স্পৃহা আরো জোরালো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা এখানে একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা। যেহেতু অধিকাংশ গেরিলাদল এবং মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন রাজনৈতিক মতপথের অনুসারী তাই তাতে পারস্পরিক সমন্বয় ও বোঝাপড়ার মারাত্মক ঘাটতি ছিল। তথাকথিত চীনপন্থী বলে পরিচিতদের একটি অংশ সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। অপর একটি অংশ ভ্রান্ত রণনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে পাকিস্তান ভেঙে যে একটি নতুন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে তার তাৎপর্য ধরতে না পেরে মুক্তিযুদ্ধকে চিহ্নিত করেছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ হিসাবে। আসলে তখনকার সময়ে বামপন্থীদের কেউই সে সময়কালের রাজনীতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। সঠিক মার্কসবাদসম্মত বিচার বিশ্লেষণের অভাবে যুদ্ধের অনিবার্যতা তারা বুঝতে পারেনি। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন ছাড়া যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলতেই পারেনা – এই মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সত্যটিও তারা ধরতে পারেনি। তাই গোটা পাকিস্তানপর্বে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে অর্থাৎ '৫২, '৬২, '৬৯ সহ এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে পরিচালিত বিভিন্ন ছোট-বড় আন্দোলনসমূহের মধ্য থেকেই যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠার কথা ছিল এবং বামপন্থীদের তাতে নেতৃত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু বামপন্থীরা যুক্তফ্রন্টের তাৎপর্যই ধরতে পারেনি। ফলে তারা রহংরমহরভরপধহঃ ভড়ৎপব হিসেবে ঘটনার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আবার যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, তখনও যদি বামপন্থীরা স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধরত জাতির সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরতো, তাহলেও তাদের একেবারে অগ্রাহ্য করে একটা যুদ্ধ পরিচালনার কথা বুর্জোয়ারা হয়তো ভাবতোনা। অর্থাৎ বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও, বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এটি পরিচালিত হলেও, দেশের মুক্তির জন্যই যেহেতু এটি হচ্ছে, তাই নেতৃত্ব যাতে কোনরকম আপসের মধ্য দিয়ে না যায়, পূর্ণ স্বাধীনতার বাইরে যাতে আর কোনরকম আলোচনা না আসে – বামপন্থীরা সেই সংগ্রাম জারি রেখে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধির ঘাটতির কারণে বামপন্থীদের মধ্যে একটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আর যারা অংশগ্রহণ করলো তারা বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের মতই যুদ্ধে অংশ নিল। এটি বামপন্থীদের এক করুণ পরিণতি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রিসভার 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠন করা হয় যার মধ্যে ছিল বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগের দুই জন করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), জাতীয় কংগ্রেস ও ভাসানী ন্যাপের একজন করে প্রতিনিধি। এই 'পরামর্শদাতা কমিটি' সত্যিকার অর্থে সংগ্রাম থেকে গড়ে উঠা যুক্তফ্রন্ট ছিলনা। ভারতের সাথে অস্থায়ী সরকারের আলোচনার ভিত্তিতে সবাইকে সাথে রাখার চিন্তা থেকে এটি গঠন করা হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তাঞ্চল গঠনের মধ্য দিয়ে শহর ঘেরাও এর পরিকল্পনা কার্যকর হতে থাকে। নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছোট ছোট মুক্তাঞ্চল বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে। গ্রাম এলাকায় পাক হানাদার বাহিনীর তৎপরতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর পুলিশ সদস্য মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে থানার সদর কার্যালয় ছেড়ে যেতে সাহস পায় নি। ফলে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রামঞ্চলও কার্যত মুক্ত। সেখানে ইয়াহিয়া বা তাঁর বশংবদ সরকারের শাসন কাজ করে না। তবে গ্রামঞ্চলে পাকিস্তানিদের হয়ে সন্ত্রাস ও অত্যাচার করে শান্তিকমিটি, রাজাকার, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগভুক্ত পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের দালালরা। বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনী, স্থানীয়ভাবে সংগঠিত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ বা কমিউনিস্ট সমর্থক গেরিলা বাহিনী এবং স্বতঃস্ফূর্ত, সুসংগঠিত নয় এরকম স্থানীয় মুক্তিসংগ্রাম কমিটি যা বহুক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির মতো গড়ে উঠেছিল – প্রভৃতির হাতেই এই সব এলাকার কর্তৃত্ব কার্যত ন্যাস্ত ছিল। সর্বত্র পিছু হটার সময় পাক বাহিনী পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। যেমন, মুক্তি বাহিনীর অগ্রগতির মুখে ভূরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী থানা ত্যাগ করার সময় হানাদার বাহিনী গ্রামবাসীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে তিন শতাধিক লোককে

হত্যা করে, বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, এমন কি পেট্রোল দিয়ে জমির পাকা ধানে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েকটি সড়ক সেতুও পাক সেনারা যাবার সময়ে ধ্বংস করে দেয়। নিজদলীয় রাজাকারদেরও পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করে। এইভাবে শত্রুসেনারা যাবার সময়ে গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করছে। মুক্তাঞ্চলে নিজ বাড়িঘরে যারা ফিরে আসছেন তাদের আশ্রয় নেই, বস্ত্র নেই, ক্ষেতের ধান বিনষ্ট হওয়ায় খাদ্য নেই।

১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর 'স্বাধীন বাংলা' সংবাদপত্রে মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, "বাংলাদেশের জনগণের লড়াইয়ের শক্তি যখন সংগঠিত এবং তাহারা যখন গৌরবজনক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তখন সেই জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে ব্যাহত করিবার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলের একটি অশুভ রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। এই চক্রান্ত সম্পর্কে আমার দেশবাসীকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং সমস্ত শক্তি দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। কয়েকটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি বাংলাদেশ সংগ্রামের মীমাংসা ও বুঝাপড়ার যে চক্রান্ত করিতেছে তাহার মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি আসিবে না। এত শহীদের রক্ত, মা-বোনের ইজ্জত ও ঘর-বাড়ী ছারখার হওয়া সবই বিফলে যাইবে। তাই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সশস্ত্র লড়াই চালাইতে হইবে।" ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এক বেতার ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "অশ্রু আর রক্ত। এরই বিনিময়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। কালের গতির সাথে সাথে স্বাধীনতার সোনালী সূর্যের ক্ষণটি নিকটতর হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে চাই আরো রক্ত, আরো অশ্রু, আরো আত্মত্যাগ, আরো জীবন ও কষ্ট।"

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি শক্তিগুলির তৎপরতা ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভারতের সাথে পাকিস্তানের যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেই অবস্থায় পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার সুযোগ সে গ্রহণ করেছে। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা আর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু ভারতের জনগণ এবং বাম প্রগতিশীল শক্তির অকৃত্রিম সমর্থন ছিল অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে বাংলাদেশী জনগণ যে লড়াই করছে তার পক্ষে। সমাজতান্ত্রিক চীনের তদানীন্তন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সংকটজনক পরিস্থিতি চলছিল, যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের দ্বারা কোটরাবদ্ধ (China contain) অবস্থায় ছিল, তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তবে চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষেও কোনো কার্যকলাপ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান একই সেন্টো-সিয়াটো সামরিক জোটভূক্ত ছিল তাই পাকিস্তানের এই বিভক্তির বিরুদ্ধে কুটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করেছে। অপরদিকে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌ-বহরের আণবিক শক্তিসম্পন্ন বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' হংকং ঠেকিয়েছে তাকে বীচ্ হেড্ করতে দেয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তা না পাওয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করতে পারল। ফলে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হল।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে' কমরেড শিবদাস ঘোষ

মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুঙ এর সুযোগ্য ছাত্র, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামের মহান পথ প্রদর্শক, ভারতের সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, তিনি তাঁর দলের বহু কর্মীকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বহু শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করতে পাঠিয়েছেন। মার্কসবাদ এর নিরিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে' এক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, "বাংলাদেশে বর্তমানে যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের অভ্যুত্থান আমরা দেখছি তার প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তা গড়ে ওঠার ইতিহাসও আমাদের খানিকটা আলোচনা করা দরকার। ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয় জাতিকে জোর করে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে যখন দুটো রাষ্ট্র স্থাপন করা হল এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র চলতে চলতে পাকিস্তান জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল এবং সেটা গড়েও উঠছিল। কিন্তু কতকগুলো কারণে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান মিলে এক পাকিস্তান জাতীয়তাবোধ ও মানসিকতা গড়ে উঠতে পারেনি। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার দূরত্ব বিরাট এবং ভৌগলিক দিক থেকে একে অপরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতিগত অর্থেও একটা মিল গড়ে তোলা দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেল। কারণ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকেও একের সাথে অপরের কোনো মিল নেই। তাছাড়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থিক অগ্রগতির জন্য পূর্ববাংলাকে প্রায় একটি 'কলোনি' তে পর্যবসিত করে ফেলেছিল। পূর্ববাংলার লোকসংখ্যা সমস্ত পাকিস্তানের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলা থেকে যা আয় হত, তার সিকিভাগ খরচ হত পূর্ববাংলার জন্য। আর বাকি সমস্ত চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কলোনিগুলিকে যেমন কাঁচামালের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে নিজের দেশের উন্নতি ও বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করে এবং সেগুলিকে পদানত করে রাখে, ঠিক তেমনি এক দেশ ও এক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে সেইরকম কলোনি বা উপনিবেশে পরিণত করেছিল।"

"কিন্তু এই ঔপনিবেশিক শোষণের উপলব্ধি এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে প্রথম দিকে গড়ে ওঠেনি এবং এক পাকিস্তানের মানসিকতা পূর্ববাংলার মানুষের মন থেকে একদিনেই ভেসে যায়নি। পূর্ববাংলার মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেদের পাকিস্তানি বলেই ভেবেছে। কিন্তু ভাষাকে ভিত্তি করে, সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নকে ভিত্তি করে পূর্ববাংলার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই আন্দোলনগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ ও ঐতিহাসিক গতি কোন দিকে তা ধরতে

পারেননি। একদিকে আন্দোলনগুলোকে জবরদস্তি রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে দমন করতে চেয়েছেন আর অন্যদিকে ধর্মীয় জিগির তুলে পাকিস্তানের একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধের ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে খাড়া রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে ওঠে না।"

"জাতি হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক প্রোডাক্ট (সৃষ্টি)। ইতিহাসের গতিপথ পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার প্রবল আকুলতা থেকে একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে আর্থিক কেন্দ্রীকতা এবং একটি কেন্দ্রীয় ধারণা গড়ে ওঠে, সেই কেন্দ্রীয় ধারণাকে ভিত্তি করে ভাষা, সংস্কৃতি এবং একটি সার্বিক আর্থিক উন্নয়নকে সামনে রেখে একটা জাতি ইতিহাসের পরিণতি হিসাবে গড়ে ওঠে। সমস্ত আধুনিক জাতিগুলি গড়ে ওঠার এই হচ্ছে পিছনকার ইতিহাস। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে পাকিস্তানকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে নিয়ে জোর করে একটা দেশ করা না হলে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ মিলেই একটা গোটা জাতি হিসাবে আজ ইতিহাসে বিরাজ করত। কিন্তু পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হওয়ার পরেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এক দেশাত্মবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো না, ভাষা ও সংস্কৃতিকে মেরে দিয়ে শুধু ইসলামিক রাষ্ট্রের নামে ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতীয়তার মনোভাব পাকিস্তানের দুই অংশে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বাস্তবে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটল দু'ভাগে বিভক্ত জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় মানসিকতা গড়ে উঠল একভাবে, আর পূর্ব পাকিস্তান, আজ যাকে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে, তার জাতীয় মানসিকতা গড়ে উঠতে আরম্ভ করল আলাদাভাবে। এই যে আলাদাভাবে বাংলাদেশের মানসিকতা পূর্ববাংলার ভৌগলিক পরিবেশের মধ্যে আলাদা করে গড়ে উঠল, একটা নতুন জাতীয়তাবোধ। যদিও সাথে সাথে একথা ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবোধেরই একটি ধারা।"

"বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের জাতীয় অভ্যুত্থান, দেশপ্রেমের অভ্যুত্থান এবং দেশাত্মবোধের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ একটা নতুন জাতি হিসাবে জন্ম নিয়েছে। একে আর এখন পাকিস্তানের অংশ বলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রূপ নিয়ে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ববাংলা হয়ে পড়েছে একটি স্বতন্ত্র জাতি। পূর্ববাংলার এই জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ এবং দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং ভিন্ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যদি জোর করে তাকে দমন করার চেষ্টা করে বা আজ যদি কোনওভাবে বাংলাদেশের এই জাতীয় অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষমও হয় তাহলেও মনে রাখতে হবে পূর্ববাংলায় নতুন জাতীয়তার উন্মেষ হয়েছে। এই বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য বারবার মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সে শেষ পর্যন্ত কায়েম করবেই। কোনও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই আজকের দিনে শেষ পর্যন্ত পুরনো কায়দায় পদানত করে রাখা যায় না।"

"তবে একথাও সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ববাংলায় যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয়েছে, পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মধ্যেই যেহেতু তার জন্ম, তাই এই জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে পাকিস্তান সম্বন্ধে দরদবোধ এবং মমত্ববোধ পূর্ববাংলার মানুষের ভাবনায় আজও জড়িয়ে আছে। ফলে আমাদের মধ্যে যাঁরা এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে দুই বাংলা এক করার আওয়াজ তুলছেন বা এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা আলাদা স্বার্থ হিসাবে দুই বাংলা এক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোভাবনা ঠিক এরকম নয় এবং ঠিক এরকমভাবে তাঁরা এ জিনিস চাইছেনও না। এক আমরা ছিলাম এবং আবার একদিন আমরা এক হব একথা ঠিক। কিন্তু এমনি করে নয়। এমনি করে এই মুহূর্তে এক করবার চেষ্টা করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনই মার খেয়ে যাবে। যাঁরা দুই বাংলা এখনই এক করার স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের একথা সবসময় মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ, এই দুই দেশেই যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোও গড়ে ওঠে তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের সীমা তুলে দিয়ে ঐক্যবিধান করা যাবে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাশাপাশি দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের জাতীয় সীমা তুলে দেওয়া যায় না। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সীমা বিলোপ করার অধিকার শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ এসে যায় না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাশাপাশি দুই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হয়ে গেলেও এবং দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কন্টেন্ট (চরিত্র) সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক হলেও যেহেতু আজও তার ফর্ম (রূপ) জাতীয়, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলোর এই ন্যাশনাল ফর্ম, এই জাতীয় রূপ, ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত হয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ জাতীয় সীমা বিলোপ করা কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। জোর করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই জাতীয় সীমা তুলে দিয়ে ঐক্যবিধান করতে গেলে সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যেই পরস্পর ঠোকাঠুকি লাগবে। কারণ, এর ফলে সেখানে একের উপর অপরের আধিপত্য ও জবরদস্তির মনোভাবের প্রশ্ন দেখা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আত্মাভিমান, যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে খাদ হয়ে মিশে আছে - জোর করে পরস্পরকে মেলাতে গিয়ে তা সমাজতন্ত্র থেকে আলাদা হবার চেষ্টা করবে। ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার খাবে।"

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি এবং রণকৌশলগত প্রশ্নে তৎকালীন অবস্থিত সামাজিক দ্বন্দ্ব সমূহের নিরিখে কমরেড শিবদাস ঘোষ একই বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "ফলে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ সার্বভৌম জাতীয় স্বাধীনতার নিচে এক ইঞ্চি নামা চলবে না – এই স্লোগান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আজ সেখানে সবচাইতে বড় করে তোলা দরকার। যেকোনও নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যেকোনো অংশ বা দল পূর্ণ স্বাধীনতার নিচে বা তার থেকে কম কোনও শর্তে আলোচনার প্রশ্ন তুলবে, তারা যেই হোক, বা যে নেতৃত্বই হোক, তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যারাই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের বর্তমান লড়াইতে সাহায্য দেবে, তাদের রাজনৈতিক মতবাদ, ধ্যানধারণা, আদর্শ যাই থাকুক না কেন, তাদেরকেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একথা যদি মনে হয় যে, মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হলে স্বাধীনতাটাই তিনি কাঁচিয়ে দেবেন তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নেই তাঁকে বাঁধতে

হবে। যারাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে লড়তে চাইবে তাদের সবাইকে নিয়েই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বাংলাদেশে বর্তমানে গড়ে তুলতে হবে। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। মুজিবর রহমান প্রথম অবস্থায় বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চেয়েছেন এবং তার জন্যই চেষ্টা করেছেন একথা ঠিক। কিন্তু পরে তিনি নিজেই বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছেন। ফলে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মডারেট নেতৃত্ব হলেও তার সঙ্গে মিলেই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বর্তমান সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বর্তমান সময়ে নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিভেদকে তাঁরা যেন বড় করে না তোলেন। কারণ, তার দ্বারা বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনকেই কার্যত তাঁরা দুর্বল করে দেবেন।" বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূল্যায়ন এর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বাংলাদেশি বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করায় তা বাঙালির জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধে যে স্লোগানগুলো ধ্বনিত হয়েছিল, "অন্ন চাই! বস্ত্র চাই! বাঁচার মত বাঁচতে চাই!" বিজয়ের আনন্দ কাটতে না কাটতেই তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর চেহারায় ব্রিটিশ-পাকিস্তানি শোষকদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে এদেশের জনসাধারণ পুনরায় হতাশায় নিমজ্জিত হল। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে দেশকে সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে ধনতান্ত্রিক কায়দায় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল এবং পুঁজিবাদের বিকাশের স্বার্থে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করছিল। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও দেশি পুঁজিপতিদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ঋণের জালে আবদ্ধ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার ১৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণ রোধ করেছিলেন। বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছিল এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধার সাথে ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছিল। এভাবে গোটা বাংলাদেশ দেশি ও বিদেশি পুঁজির অবাধ লুন্ঠনের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হলো। পুঁজিবাদী বিকাশকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে তৎকালীন বাস্তবতায় ব্যাংক, বীমা ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা হয়েছিল। এর সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। এটি করা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে। এর মধ্য দিয়ে বরং রাষ্ট্রীয় পুঁজির জন্ম দিয়ে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা চলছিল। তৎকালীন সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব বৈদেশিক বাণিজ্য রপ্তানি ও আমদানি লাইসেন্স এবং আমদানিকৃত পণ্য বন্টনের মাধ্যমে শহর, নগর ও গ্রামাঞ্চলে বণিকগোষ্ঠীর শক্তিকে সংহত করছিল এবং শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরাট পেটোয়া বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্য দিয়ে মজুতদারি, চোরাকারবারি, দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতিকে উৎসাহিত করে লুটপাটের মধ্য দিয়ে একটি পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান উৎসাহিত করা হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি চূড়ান্ত ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করল। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতি দুরারোগ্য ব্যাধির মত রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে গেল। পুঁজির পুঞ্জীভবনের মধ্য দিয়ে বিশাল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভেঙে সম্পদ হারিয়ে গরীব ও নিম্ন আয়ের মানুষে পরিণত হতে থাকলো। অল্প কিছু মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হলো সীমাহীন সম্পদ। সমগ্র বাংলাদেশে জোরদার হল ধনিক, বুর্জোয়াশ্রেণী। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হল চাকুরীজীবি, মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষ, ক্রমাগত ভূমিহীন হলো ক্ষুদ্র কৃষক, বেড়ে চলল মৃত্যুপথযাত্রী গ্রামীণ ভূমিহীন মজুর।

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা থাকলেও জাতীয় জীবনে ধর্মীয় ভাবধারার প্রসার বাড়তে থাকে। সরকার বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন যা ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত করে। সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিবর রহমান ওআইসি (Organisation of the Islamic Conference) এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সদস্যপদ পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সালে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য লাহোর গমন করেন এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর বক্তৃতাসমূহে ক্রমাগত ইসলামী অভিবাদন এবং সম্ভাষণের মাত্রা বাড়াতে থাকেন। তিনি দালাল আইনে গ্রেপ্তারকৃত যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং জাতি গঠনে তাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তৎকালীন সরকারের প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে যখন হাজারও মানুষ ক্ষুধায় মারা গিয়েছিল। অমর্ত্য সেনের মতে, এ দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির কারণে হয়নি বরং তখনকার সময়ে সরকার পরিচালনায় ঘাটতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাবের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। রাতারাতি কিছু মানুষ প্রচণ্ড ধনী হয়ে গেল ব্যাপক লুটপাট, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্পদ লুটপাট করে। মুদ্রাস্ফীতির উর্দ্ধগতি আর জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমাগত অলাভজনক অবস্থার ফলে দেশের অর্থনীতি একেবারে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারে দেশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সরকার ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে এবং এই ধারায় ১৯৭৫ সালের ৭ জুন সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে একদলীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) কায়েম করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার তৎকালীন বামপন্থী পার্টিগুলির ভূমিকা। সিপিবি, ন্যাপসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহ পার্টি বিলুপ্ত করে এসময়ে বাকশালে যোগদান করেন। যদিও এ সময়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছিল। সরকারের এ পদক্ষেপ থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের দুর্বল প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্র ততোধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টি এবং সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠার কারণে স্থানীয় আর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তদুপরি, জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালানোর ঘটনা সকলের জানা। এধরনের বেসামাল পরিস্থিতির সুযোগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে সেনাশাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে মিলিটারি স্বৈরশাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

'৭২ এর সংবিধান প্রসঙ্গে

১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল, "আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা - যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;"

লক্ষণীয় যে, সংবিধানের প্রণেতারা জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায়ই জনগণকে প্রবঞ্চিত করার সিংহদ্বার উন্মোচিত করেছে। বাস্তবে উপরোক্ত কথাগুলি পরবর্তীতে আইন দ্বারা সুরক্ষিত হয়নি তাই এর বুলি সর্বস্বতা সহজেই অনুমেয়। এসকল কথা সংবিধানে সংযোজিত হওয়ার কোন সুফলই জনগণের কাছে কখনই অনুভূত হয়নি।

'৭২-এর সংবিধানের প্রধান ফাঁকি হল এ সংবিধানে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে অঙ্গীকারের পর্যায়ে রাখা হয়েছে, মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বোঝা যায় এটা জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণার জন্যই করা হয়েছিল। এ ছাড়া ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের অধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যতটুকু ছাপ আপেক্ষিক অর্থে হলেও সংবিধানে পড়েছিল অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যাকে অস্বীকার করতে পারেনি তা গত ৪৪ বছরের বুর্জোয়া শাসনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একটা গোঁজামিলের দলিলে পরিণত হয়েছে। সংবিধান জনগণের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রচিত হবে এবং জনগণের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিতও হবে। তবে বিগত দিনে ১৫টি সংশোধনী বলতে গেলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, চেতনা কিংবা স্বার্থ কোনটা সংরক্ষণ বা বিকাশের জন্য হয়নি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র মানে কোনো না কোনো শ্রেণীর রাষ্ট্র। আর সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিধায় সংবিধানে শ্রেণী-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের সীমাহীন আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যতটুকু আকাঙ্ক্ষাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল, দেশের মাটিতে রক্তের দাগ না শুকাতেই তারা তা কর্তন ও লঙ্ঘন করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি ঘোষণা করে প্রণীত এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকর হয় আমাদের সংবিধান। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে যে সংবিধান বাংলাদেশে বলবৎ হয়েছিল, তা অক্ষত অবস্থায় এক বছরও অতিক্রম করতে পারে নি। সংবিধান জারির সাত মাসের মাথায় ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী কার্যকর হয়। এই দ্বিতীয় সংশোধনী দিয়ে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে ২৬ থেকে ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ আছে। এখানে বলা আছে, রাষ্ট্র নাগরিকদের কোন কোন অধিকারের নিশ্চয়তা দেবে। যদিও ওই অনুচ্ছেদসমূহে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজ-কে মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। মূল সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, ওই সমস্ত মৌলিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়। অর্থাৎ দেশে এমন কোনো আইন থাকতে পারবে না বা ভবিষ্যতেও প্রণয়ন করা যাবে না যা 'মৌলিক অধিকারে'র পরিপন্থী। এই বিধানের বদৌলতে ইংরেজ ও পাকিস্তানি আমলে প্রণীত সকল অগণতান্ত্রিক কালাকানুন আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে। সেই সাথে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছামত এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না যা সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত কোনো মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে। এর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদকে দেয়া হলো। অর্থাৎ সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদ যেমন সংশোধন করা যায় তেমনি মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলিও সংশোধন করা যাবে। কাজেই সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী কালাকানুন জারির সিংহদ্বার খুলে দেয় যা পরবর্তী সংশোধনীগুলির মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়।

সংবিধানে ১৩ থেকে ১৫ অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে জনগণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান, জীবনের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তিসঙ্গত মজুরি প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে।

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জনসাধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

(খ) কর্মের অধিকার ও কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি, বা পঙ্গুত্বজনিত কারণে কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।”

অথচ শাসকরা চালু করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতি যা সংবিধান পরিপন্থী। এই মুক্তবাজার অর্থনীতি সমগ্র ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে ওঠা ’৭১ এর মৌল চেতনা এবং তারই প্রেক্ষাপটে রচিত সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। কাজের অধিকার দেয়া দূরে থাক, শিল্প-কারখানা-ব্যাংক-বীমা বন্ধ করে বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। বেকারদের ভাতা দেয়া এবং অসুস্থ, পঙ্গু, বিধবা, এতিম, বৃদ্ধ ইত্যাদি অসহায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় ভাতা ও বিবিধ সাহায্য প্রদানের কথা বলা আছে যার কোনো বাস্তবায়ন নেই। বাস্তবে, ১৩-১৫ অনুচ্ছেদ জনগণকে বিভ্রান্ত ও ঠকানোর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে, যা প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে পদদলিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক মুক্তিতে মার্কসবাদের উজ্জল দৃষ্টান্ত

এদেশের সংগ্রামী জনসাধারণ তাদের মুক্তির জন্য যতই লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা করুক না কেন তাঁরা তাঁদের লড়াইকে সমাজ বিকাশের নিয়মে ফেলে বিচার করতে পারেননি। তাই যতবার তাঁদের লড়াই ব্যর্থ হয়েছে তাঁরা নিজেদের নিয়তিকে দায়ী করেছেন। এদেশে যদি যথার্থ মার্কসবাদী দল থাকতো এবং জনগণকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ও সংগঠিত করতে পারতো এবং মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারতো তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো এবং বুর্জোয়াশ্রেণী নিজস্ব শোষণ কায়েমের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করতে পারতো না। যদিও অবিভক্ত ভারতের সময় থেকেই এখানে মার্কসবাদী চিন্তার প্রভাব এসেছিল। কিন্তু এদেশের তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, যেটা যথার্থ মার্কসবাদী দল ছিল না, তারই অংশ ছিল এবং একই সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী ও উগ্র বামপন্থার ঐতিহ্য বহন করছিল।

আমরা যদি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিকে তাকাই তা হলে যা দেখতে পাই তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি শিক্ষণীয়। এর নজির মানব ইতিহাসে ইতিপুর্বে কখনই সৃষ্টি হয়নি। মার্কসবাদের প্রাথমিক পাঠ থেকে আমরা জানি যে, আজকের যুগে শোষিত-নির্যাতিত জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা মানে হবে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত ইউনিয়নে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ সালে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর ১৯৩৩ সালেই তিনি ঘোষণা দেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ বেকারত্ব কাকে বলে তা ভুলে গেছে। উৎপাদনে প্রাচুর্য সৃষ্টি ও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ছাড়া শোষণমুক্তির কথা বলা ফাঁকা বুলিরই নামান্তর। উৎপাদনে প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে হলে অর্থনীতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাতে হবে কারণ অর্থনীতি হল ভিত্তি। ১৯৩৩ সালের ৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের যৌথ প্লেনামে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়নে এঐঊ জঊঝটখঞ্ঝ ঙঋ এঐঊ ঋওজঝঞ ঋওঠঊ-ণঊঅজ চখঅঘ শীর্ষক রিপোর্টে কমরেড স্ট্যালিন দেখিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য। তিনি দেখিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে লোহা ও ইস্পাত, ট্র্যাক্টর, অটোমোবাইল, মেশিন টুল, আধুনিক রাসায়নিক শিল্প, আধুনিক কৃষি যন্ত্র উৎপাদন শিল্প, বিমান শিল্প প্রভৃতি শিল্প ছিল না। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এ সকল কলকারখানা সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুত, তেল এবং কয়লা উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে সর্বশেষ অবস্থানে ছিল। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক্ষেত্রগুলোতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়লা ও ধাতুর নতুন ঘাঁটি গড়ে উঠল। এভাবে মহান স্ট্যালিন তাঁর ততোধিক মহৎ নেতৃত্বে সংঘটিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এসকল মহৎ কীর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো রিপোর্ট করেছেন যে এসকল নতুন বিশাল শিল্প কারখানাগুলো মাত্রা আর পরিমাপের দিক থেকে ইউরোপীয় শিল্পগুলোকে বহুমাত্রায় অতিক্রম করে গেছে। এবং এর ফলে এসকল শিল্প হতে সমস্ত পুঁজিবাদী উপকরণ দূরীভূত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে শিল্পে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক রূপই বিরাজ করছে। এসকল পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ১৯২৮ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুর সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের যে অনুপাত ৪৮ শতাংশ ছিল তা বেড়ে ১৯৩২ সালে অর্থাৎ চার বছরের মধ্যে ৭০ শতাংশে উন্নীত হলো যার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরাতন কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ২২ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে স্ট্যালিন মন্তব্য করেছেন, “পুঁজিবাদী দেশগুলোর জন্য এই হারে শিল্প উৎপাদন বর্ধিতকরণ একটি দুঃসাধ্য বিষয়। এবং শিল্পে শুধুমাত্র এই হারে লক্ষমাত্রা অর্জন নয় – এমনকি ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধিও একটি দুঃসাধ্য লক্ষ্য। কিন্তু এরপরও তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সোভিয়েত রাষ্ট্রে, সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনে ১৩-১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন আমাদের জন্য ন্যূনতম এবং আমাদের তা অর্জন করতেই হবে।”

প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই লক্ষ যৌথ খামার এবং পাঁচ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে ওঠে। কমরেড স্ট্যালিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, “এমন একটি দেশের নাম বলুন যে তিন বছরের মধ্যে দুই লক্ষ পাঁচ হাজারটি নয় কেবল পঁচিশ হাজারটি নতুন এন্টারপ্রাইজ গড়ে তুলেছে। আপনারা তা করতে পারবেন না কারণ এমন একটি দেশ নাই এবং এমন একটি দেশ ছিলও না।” প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ ভুলে গিয়েছিল বেকারত্ব

আর তা থেকে উদ্ভুত যন্ত্রণা কি। ১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে যে অর্জন তাতে বৃহৎ শিল্প উৎপাদনে শ্রমিক এবং অন্যান্য জনবল নিয়োগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫৭ শতাংশ বেশি অর্জিত হয়েছে, জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধিতে লক্ষমাত্রার থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি, শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে ১৯২৮ সালের থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি, ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ২৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১১১ শতাংশ বেশি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

দেশীয় পুঁজিবাদের সাথে বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়া বাঁধা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি

এবার পুনরায় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সংহতকরণের উদ্যোগের দিকে নজর দেয়া যাক। পরিস্থিতির দিকে ফেরা যাক। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশের জনগণ কেবলমাত্র একটি প্রত্যাশা নিয়ে বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সেটি হল শোষণমুক্তির প্রত্যাশা। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের দুটি উপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নিংড়ে নিয়ে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি যখন তাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তখন ভেবেছিল এবার তারা শোষণের হাত থেকে মুক্ত হবে। এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিনির্মাণের দিকে একটু তাকানো যাক। পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি ও শিল্প মালিকরা ১৯৭১ সালে বিতাড়িত হওয়ার পর নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে বাজেয়াপ্ত করেছিল। বাংলাদেশ সরকার হঠাৎ করেই ৩০০ মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে যায় যা তৎকালীন মোট সম্পদের ৯০ ভাগ ছিল। স্বাধীনতার পরপরই এদেশে তেমন কোনো বৃহৎ পুঁজিপতি না থাকায় তৎকালীন সরকার উপরোক্ত শিল্পসমূহকে দেখাশোনার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন এর মাধ্যমে জাতীয়করণ করে। এর মধ্যে রয়েছে - পাট, বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, কাগজ, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ফার্মাসিউটিক্যালস্, প্রকৌশল এবং শিপ বিল্ডিং, খনিজ পদার্থ, তেল এবং গ্যাস, খাদ্যজাত দ্রব্য এবং বনজ দ্রব্য ইত্যাদি। সরকার শত শত শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং পরিত্যক্ত জমি ও পুঁজি জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে এবং প্রচুর পরিমাণ বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজ সংহত করার সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পুনর্বাসন এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রথম প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন। প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে ১৯৭৩ সালে। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কুটির শিল্পে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যে উপনিবেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন বুর্জোয়া দেশগুলো জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছিল, যদিও সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মৌলিকভাবেই পৃথক। বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৭৩-১৯৭৮ সালে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৪৫৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫.৫ শতাংশ আর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৪ শতাংশ। দ্বিতীয় ('৮০-'৮৫), তৃতীয় ('৮৫-'৯০), চতুর্থ ('৯০-'৯৫) ও পঞ্চম ('৯৭-২০০২) পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৫.৪, ৫.৪, ৫.০, ৭.০ শতাংশ আর অর্জিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩.৮, ৩.৮, ৪.১৫ এবং ৫.৫ শতাংশ। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ২০০২-২০০৬ এবং ২০০৬-২০১০ অর্থ বছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৫ এবং ৬.৩ শতাংশ। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে মোট ১৭২০০, ৩৮৬০০, ৬২০০০, ১৯৫৯৫২ কোটি টাকা গৃহীত হয়। লক্ষণীয় যে ক্রমান্বয়ে সরকারী খাত থেকে কিভাবে বেসরকারি খাতে বরাদ্দ বাড়তে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৯৫২, ১১১০০, ২৫০০০, ৩৪৭০০ এবং ৮৫৮৯৪ কোটি টাকা কিন্তু বেসরকারী খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বেড়ে ৫০৩, ৬১০০, ১৩৬০০, ২৭৩০০, ১১০০৫৮ কোটি টাকা দাঁড়াল। ("Five Year Plan in Bangladesh") অর্থাৎ শতকরা হিসাবে সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থের আকার বেড়েছে ১২.৭%, ৫৫%, ৫৪.৪%, ৭৮.৭% এবং ১২৮%। এভাবে বেসরকারি খাতকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষিত মূল চেতনা পরিপন্থী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া সরকারগুলো সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal - MDG), দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী সুপারিশ বাস্তবায়ন করছে কারণ সাম্রজ্যবাদীদের সুপারিশ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সম্পূরক। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে যে সকল নীতিমালা রয়েছে তার মধ্যে পলিসি ম্যাট্রিক্স-৩ এ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে ব্যক্তি খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন। এর মাধ্যমে পুঁজি বাজার জোরদার করতে বলা হয়েছে। গ্যাট চুক্তি/WTO-এর আওতায় ছিল "Structural Readjustment" বা "কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস" যা বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির শর্ত হিসাবে আরোপ করা হত। এর মাধ্যমে হাজার হাজার ছাঁটাই ও লে অফ এর মাধ্যমে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিল তা ব্যাপক হাহাকার নিয়ে এসেছিল। কথিত দাতা সংস্থা যারা আসলে উন্নত বিশ্বের অলস পুঁজির বিনিয়োগকারী (বিপুল সুদের বিনিময়ে) তারা আমাদের দেশের প্রণীত সর্বশেষ বাজেটে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা এক নজর দেখে নেয়া যাক্। সাম্প্রতিক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থায়নের যে উৎস দেখানো হয়েছে তাতে ধরা হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর ৫৯.৮% যা বাজেটে সিংহভাগ এবং এই প্রধান অর্থায়নের উৎস এদেশেরই জনগণ। এছাড়াও কর ব্যতীত প্রাপ্তি ১১%, অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ১৭.৩%, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর ২.২% এবং বৈদেশিক ঋণ ৭.২%। এদিকে বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ কেবলমাত্র ২.৫%। জাতীয় বাজেটের এই অপ্রতুল হারে অনুদানও নানাভাবে শর্ত আরোপিত

যা হিসাবে নিলে ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। যেমন এটুকু হারে বিদেশি সাহায্য পেতে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এর নামে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে, বহু সরকারী লাভজনক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ব্যাংক- বীমাসহ সেবাখাত এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প ও কৃষিখাতকে নাম মাত্র মূল্যে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে দেশ সম্পদ হারিয়েছে। তথাপি সরকারের কাছে তারাই ডেভেলপমেন্ট পার্টনার আর যাদের রক্তে ঘামে দেশ নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ২০১৪-২০১৫ সালে ২,৫০,৫০৬ কোটি টাকার মতো এতো বিশাল একটা বাজেট প্রণয়ন করতে পেরেছে তারা যেন নিতান্তই দায়ে ঠেকা কিছু প্রাণী।

’৯০ এর পরে বিশ্বায়নের নামে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে নয়া উপনিবেশিক শোষণ। বিশ্বায়নের নামে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সুপারিশক্রমে সামান্য বৈদেশিক সাহায্যের আশায় বাংলাদেশের সরকারসমূহ মুক্তবাজার অর্থনীতি তো চালু করেছেই এছাড়াও জাতির নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সমুদ্রবন্দর, খনিজ সম্পদ, জ্বালানি পর্যন্ত শুধু বেসরকারীকরণ নয় এমনকি বিদেশি বিনিয়োগ অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে নানাভাবে সাহায্য বন্ধের হুমকি প্রদান করেছে। অথচ তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির অগ্রগণ্য মুখপাত্র কতটা এ ধারণায় একনিষ্ঠ তা নানা ঘটনায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উগান্ডা ও তানজানিয়ায় বাংলাদেশি কোম্পানি ৪০,০০০ হেক্টর জমি কিনে কৃষিকাজ করে সেই ফসল দেশে নিয়ে আসার পর বাংলাদেশ সরকার যখন খাদ্য ঘাটতির জন্য ব্যবহার করে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার দেশসমূহকে নয়া উপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন আফ্রিকান দেশগুলোকে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সজাগ হতে হবে যাতে তারা অপর দেশের অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের কবলে না পড়ে। মার্কিনীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে যে তারা আফ্রিকাকে বাংলাদেশ বা অপর কোন দেশের হাতে নয়া উপনিবেশ হতে দেখতে চায় না। ভূতের মুখে রামনাম! আসলে মুক্তবাজার অর্থনীতির যে সত্যিকারের মুক্ত নয় এর মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিকভাবে অসম বিশ্বে ধনী রাষ্ট্রগুলো তাদের শক্তিশালী পুঁজির দাপটে এবং সামরিক কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে লণ্ঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য তথাকথিত New World Order বা বিশ্বায়ন তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে নয়া উপনিবেশিক শাসন চালু করেছে।

বেসরকারিকরণের পাগলা ঘোড়া কি পরিমাণে সম্পদ বড় পুঁজির মালিকদের হাতে পুঞ্জীভূত করেছে তাঁর কিছু নজির পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত ঐ সব কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক টার্নওভার থেকে। কোম্পানীগুলোর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সূত্রমতে, তাদের বার্ষিক টার্নওভার – স্কয়ার ৩৬০০ কোটি, বসুন্ধরা ২৬০০ কোটি, মেঘনা ১৬০০০ কোটি, ট্রান্সকম ২৮০০ কোটি, একমি ৪৮০ কোটি, পারটেক্স৩২০০ কোটি, এসিআই ২১৯৭ কোটি, আবুল খায়ের ৮০০০ কোটি, পিএইচপি ২৪০০ কোটি, একেইউ ৩৫০০ কোটি, নাসির গ্রুপ ২০০০ কোটি, টিকে ৩৫০০ কোটি, ইউনাইটেড ৮৫ কোটি, ওরিয়ন ১৫০০ কোটি, রহিমা আফরোজ ৪০০০ কোটি, বেক্সিমকো ১৮৫০ কোটি টাকা। এগুলো হলো তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য। বাস্তবে তা অনেক বেশি সেকথা বলাই বাহুল্য।

কৃষিতেও একই ভাবে ব্যাপক সম্পদের পুঞ্জীভবনের ফলে বিগত বছরগুলোতে সম্পদহারা হয়েছে বিপুল জনগোষ্ঠী। ফেব্রুয়ারী ২০১২ সালে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা’য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে “গ্রাম বাংলায় কৃষি ও অকৃষি সম্পদের পরিবর্তন এবং গ্রামীণ জীবিকা” শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত বছরগুলোতে ভূমিহীনতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৯ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৪৮ শতাংশ জমি। উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, একটি ৬ সদস্যের পরিবারের জন্য ন্যূনতম এক একর জমি প্রয়োজন। প্রতি বছর জমি হারানোর ফলে ১০-১৫ লাখ লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজশ করে চলা শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের গালভরা সব বুলি “চুইয়ে পড়া অর্থনীতি”, “অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন”, “সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা”, “দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র” প্রভৃতির আড়ালে শুধু একটিমাত্র কৌশলপত্র রয়েছে। আর তা হল সম্পদশালীকে আরও সম্পদশালী করা এবং সম্পদহারাকে আরও সম্পদহারা করা। জনগণের সম্পদ তেল, গ্যাসসহ অপরাপর খনিজ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থার লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত জনগণকে বারবার মোকাবেলা করে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে। তার সাথে চক্রান্ত রয়েছে সেবাখাতকে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র করে তোলা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, বিনোদন প্রভৃতিকে পণ্যে পরিণত করে এবং তার দ্বারা দেশের জনগণের প্রতি একদা রাষ্ট্রের অঙ্গীকারকে ধ্বংস করে “বাজার অর্থনীতির” পরিপূরক করে তোলা। বাজার অর্থনীতির পরিপূরক করার লক্ষ্যে ব্যাপক ভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধস নামানোর প্রচেষ্টায় সহজলভ্য করা হচ্ছে মাদক, পর্নো প্রভৃতি। বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমা, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের অবস্থিত নৈতিকতা ধ্বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে আক্রমণের শিকার হচ্ছে নারী, শিশুসহ দৈহিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠি। সমাজ থেকে তিরোহিত হচ্ছে সংবেদনশীল মনন কাঠামো। দ্রুত উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ছে বয়োজ্যেষ্ঠসহ দেশের বেশিরভাগ মানুষ। কারণ মুষ্টিমেয় কিছু সম্পদশালী আর তাদের সহায়তাপ্রদানকারী কিছু মানুষ ছাড়া বাকি সব মানুষ যেন উদ্বৃত্ত। অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা। বাজারের প্রয়োজন ব্যতীত বাকি সকল কিছু অপ্রয়োজনীয়, অলাভজনক, অতিরিক্ত।

দেশের অর্থনীতির উপর কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে, ফলে নতুন অল্প সংখ্যক কিছু মধ্য আয়ের লোকের বিকাশ ঘটছে। নতুন স্বচ্ছল মধ্যবিত্তদের সমাবেশ কর্পোরেট হাউজগুলির ক্রিয়াকলাপ, আউটসোর্সিং-এর মধ্য দিয়ে কিছু চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে - এতে মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা speculation তৈরি হয়েছে যে তারাও বড়লোক হতে পারে। পুঁজিপতিরা তাদের প্রচারের কাজে এই অংশকে ব্যবহার করছে। শেয়ার মার্কেট, ফাটকা পুঁজি – এসবে মধ্যবিত্তদের একটা বিচরণ চলছে। সার্ভিস সেক্টরেও এদের বড় অংশগ্রহণ আছে। পুঁজিপতিরা তাদের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে এদেরকে কাজে লাগাচ্ছে। আবার এর মধ্য দিয়ে কিছু যে স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হওয়ার চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছিল

এতে পা দিয়ে মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তদের একটা অংশ শেয়ার বাজার-এমএলএম ব্যবসার মধ্য দিয়ে সর্বসান্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবি জনসাধারণ অর্থাৎ গার্মেন্টস ও অপরাপর শিল্প শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুর, বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, দিনমজুর এর অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের অর্থনীতি সর্বনিম্ন উন্নয়নের দেশ (Least Developed Country) থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশ (Developing Country) এ পরিণত হয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। এক সূত্র মতে বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের উপর নির্ভরশীলতা ৮৫ শতাংশ (১৯৮৮ সালে) থেকে ২ শতাংশে (২০১০ সালে) দাঁড়িয়েছে এবং মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে দাড়িয়েছে ১০৪৪ মার্কিন ডলার যা বিশ্বে গড়ে ৮৯৮৫ মার্কিন ডলার এর সাথে তুলনীয় (ইন্টারনেট সূত্র)। কিন্তু এরপরও এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের উপর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের বোঝা যার পরিমাণ ২৯.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ২০১২ সালে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ৬৮তম যার পরিমাণ ২৪.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২ সালে শিল্পে প্রবৃদ্ধি ২৮.৬ শতাংশ অর্থাৎ ২১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৭তম। Labour Force Survey 2005-’06 and 2011, Bangladesh Bureau of Statistics-এর এক জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালে ১৪৭.৭৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৯৫.৫ মিলিয়ন ১৫ বছরের উর্দ্ধে যার মধ্যে ৫৪.১ মিলিয়ন কর্মে নিযুক্ত। এর মধ্যে আবার ১০.৯৯ মিলিয়ন জনসাধারণ উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত নয়। আর ৩৮.৯ মিলিয়ন জনসাধারণকে কর্মীবাহিনীর মধ্যে ধরাই হয় নি। দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসাবে এখনও টিকে রয়েছে। গার্মেন্টস, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ (Export Processing Zone) এলাকায় শিল্পকারখানা, চা শিল্প, জাহাজ ভাঙা শিল্প, বেসরকারি শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করে ঐসকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শ্রমশোষণ তীব্র করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন নামিয়ে এনে তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা হচ্ছে।

বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক লুটতরাজ যা ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলের চেয়েও তীব্র এই পরিস্থিতিতেও এদেশে জনগণের কোন আন্দোলন সংগ্রাম দানা বাঁধতে পারছে না কারণ জনগণের বিক্ষোভকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার জন্য নানাধরণের এনজিও তৎপরতা এদেশে রয়েছে। এদেশে এনজিও তৎপরতা এতই শক্তিশালী যে তা বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কার, ব্রিটিশদের দুর্লভ নাইট উপাধি আমাদের এনে দিয়েছে! সারা পৃথিবীর কাছে এখন বাংলাদেশ এনজিও কার্যক্রমের শিক্ষক। জনগণের বিক্ষোভকে কিভাবে কিছু টোট্‌কা-দাওয়াই এর মধ্যে ফাঁসিয়ে রাখা যায় তার জন্য বড় বড় গবেষণা কর্মকাণ্ড চলে। এবং সেই অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব হাজির করা হয়। একাজের পাশাপাশি আবার এনজিও তৎপরতা একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা যেমন ক্ষুদ্র ঋণপ্রকল্প - এক্ষেত্রে ট্যাক্স ও কর দিতে হয় না, পুঁজির অনিশ্চয়তা নেই আর সুদের পরিমাণ ব্রিটিশ আমলের মহাজনী সুদকেও হার মানায়।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষ

এর উপর রয়েছে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর দ্বিতীয় দফায় রাজনৈতিক সংঘাত ও ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে আসা দেশের অপর এক রাষ্ট্রপ্রধান সাবেক সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তন হয় এবং হুসেইন মোহাম্মাদ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাঁর দুঃশাসনে দেশের দুর্দশা আরও বাড়ে। জনগণের তীব্র রোষে অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের এর মধ্যে দিয়ে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর শুরু হলো আওয়ামী লীগ আর বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজনীতির লড়াই। এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে দেশের অপরাপর সকল বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়ে ক্ষমতায় আরোহন। দেশের মানুষের দৃষ্টি যাতে মূল সমস্যায় নিবদ্ধ হতে না পারে সেকারণে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আর তাদের রাজনৈতিক অনুসারী অপরাপর দলগুলো কৃত্রিম রাজনৈতিক কোন্দলে জনগণকে আটকে রাখে। এসকল বিরোধ কখনও এমন তীব্র পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত অজস্র নিরীহ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে।

বুর্জোয়া রাজনীতিতে অপর একটি শক্তি হিসাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে ’৯০ এর পরাজিত শক্তি হুসেইন মোহাম্মাদ এরশাদের জাতীয় পার্টি। সুযোগ সন্ধানী এই রাজনৈতিক দলটির ক্ষমতায় আরোহণ করা একমাত্র উদ্দেশ্য। বাস্তবে এরশাদ পতনের পর বিএনপি-আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জনগণের উপর যে আরও ভয়াবহ নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে, তাতে মানুষের কাছে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব আর সেইরকম তীব্রতা নিয়ে নেই। ’৯০ গণ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলসমূহ এখন ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার জন্য জাতীয় পার্টির কাছে ধর্ণা দেয়। এর মধ্যে ডান, বাম, বিএনপি, আওয়ামী লীগ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

সাম্প্রতিক সময়ে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি মৌলিক অবনমনের চিত্র তুলে ধরেছে। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শাসনযন্ত্রে ক্রমাগত ফ্যাসিস্টরূপের প্রতিফলন ঘটেছে তেমনি আবার অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের গভীর সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগেরে আধিপত্য বিস্তারের নিরিখে রণকৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আছে। আবার এ ব্যাপারে ভারত অত্যন্ত সতর্ক যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারত সর্বদা সহযোগিতা বজায় রেখে চলতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করুক ভারত তা চায় না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে পূর্ববর্তী ভারত সরকারের সুসম্পর্ক থাকায় ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পরিস্থিতিতে ভারত সর্বাপেক্ষা মিত্র রাষ্ট্র ছিল। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে তৎকালীন ভারত সরকার আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে চীন পরিপূর্ণভাবে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় চীনের যে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা ছিল তার আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই। ফলে যেখানেই

বাজার সেখানেই চীনারা উপস্থিত হয় এবং মৌনভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের কাছে চীনের আগ্রহের বিষয় তার বাজার এবং ভারতের মতই বঙ্গোপসাগরে মার্কিন আগ্রহের বিষয়ে চীনের সতর্কতা। কাজেই যে সরকারই তাকে একটি স্থিতিশীল বাজার দিতে পারবে তাকেই চীন তার কৌশলী বাণিজ্যের কারণে সমর্থন দেবে। এদিকে আবার রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। ফলে ব্রিকসভূক্ত প্রধান দেশগুলোর সাথে বর্তমান সরকারের স্বার্থ মিলেমিশে আছে। আবার এদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সরকারের এধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু বাংলাদেশের কর্পোরেট হাউজ, ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ পরিস্থিতির নিশ্চয়তার জন্য আওয়ামী লীগের উপর নির্ভর করতে চাইছে। কারণ বাংলাদেশে রয়েছে সবচেয়ে সস্তা শ্রমের বাজার। তাই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর দৃষ্টিও বাংলাদেশের দিকে। তারা অন্যান্য দেশ থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে এদেশে খাটাতে চায়। এতে তাদের মুনাফা বেশি হবে। এতে দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থও জড়িত। কারণ তারা কোলাবরেশনে পুঁজি খাটিয়ে এই মুনাফার অংশীদার হবে। তাই তারা সবাই দেশে দেশে একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চায়। এটা দিতে পারে আওয়ামী লীগ। জনগণের তীব্র ক্ষোভ আর অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগেরই কেবলমাত্র মাঠপর্যায়ের সংগঠন এবং তার একটি অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। ফলে জনগণের ক্ষমতাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হলে আওয়ামী লীগ যত দক্ষতার সাথে পারবে তা অন্য কোন বুর্জোয়া সংগঠনের পক্ষে পারা দুরূহ। বাংলাদেশ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হওয়ায় সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালি- মিলিটারি-বুরোক্র্যাটিক- কমপ্লেক্স পুঁজির স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবসায়ীদের আওয়ামী লীগ নির্ভরতাকে সমর্থন করছে। দেশের অভ্যন্তরে এধরনের বোঝাপড়া থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনের বিরোধিতা শুরুতে করলেও পরবর্তীতে হাল ছেড়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে ৫ জানুয়ারি প্রায় ভোটারবিহীন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা যে আজ সামান্যতম নিয়মনীতিরও তোয়াক্কা করতে চাইছে না, যেনতেনভাবে ক্ষমতায় আসা যে একটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য তা প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের সময় পূর্বের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়ে নতুন মাত্রায় এ সত্য প্রমাণিত হয়।

এর মধ্যে অধিকতর সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে দেশ যখন সাম্প্রদায়িক সংঘাতে মানুষ লিপ্ত হচ্ছে, যার সাথে জড়িত আছে জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। ব্রিটিশ শাসনের যুগে যথার্থ সেক্যুলার জাতীয় নেতৃত্ব না থাকায়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধ না গড়ে ওঠায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সাম্প্রদায়িকতার সেই হিংস্রতা আজও ভারত উপমহাদেশের প্রতিটি দেশে উগ্রভাবে রয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভক্তকারী মুসলিম লীগের রাজনীতি পাকিস্তান গঠনের অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানপ্রেমীরা রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি নামে শান্তিকমিটির মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে কাজ করে। '৭১ এর এই সকল পরাজিত শক্তি পরবর্তীতে নানা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। আজকের যুগে যখন পুঁজিবাদ একটি অকার্যকার ব্যবস্থা হিসাবে ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে তখন পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনা সম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠির উপর শোষণের নিগঢ় আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাদের কার্যকারিতা অপরিসীম। সেই কারণে বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে '৭১-এর পরাজিত গোষ্ঠিসহ অপরাপর রাজনৈতিক শক্তি সমূহ টিকে আছে এবং শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ বর্তমানকালে অত্যন্ত সংগঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ও মদদপুষ্ট। বাংলাদেশের ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক দলসমূহের মধ্যে সবচাইতে সংগঠিত জামাতে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের লেজুড় পেট্রোডলারের দেশসমূহের আস্থাভাজন শক্তি হিসাবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই প্রতীয়মান হয়েছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহকে কাজে লাগানোর উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ পরিস্থিতিতে একাত্তরের পরাজিত শক্তি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সমর্থন কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকাপোক্ত আসন গেঁড়ে বসেছে। আর সাম্প্রতিককালে 'হেফাজতে ইসলাম' বাংলাদেশ নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক দলসমূহের একটি জোট বাংলাদেশের সংবিধান এবং নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কোমলমতি মাদ্রাসার ছাত্রদের কাজে লাগিয়ে রাজধানীর বুকে সমাবেশ করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্জনসমূহকে পদদলিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

এখন দেখা যাক, সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা কি বুঝি? সাম্প্রদায়িকতা কি কেবলমাত্র ধর্মান্ধতা নাকি তা শোষণমূলক আধুনিক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একটি উপসর্গ। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় অর্থাৎ দাস অথবা সামন্তীয় সমাজব্যবস্থায় ধর্ম প্রধানতঃ বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের রূপে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোই সেসময়ে ন্যায়যুদ্ধে মূল মন্ত্রণা এবং প্রেরণার উৎস ছিল। সময়ের আবর্তনে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের আধারে উৎপাদিকা শক্তি যখন আর বিকশিত হতে পারছিল না তখন উৎপাদন সম্পর্কগুলো জগদ্দল পাথরের মত উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সেসময়ে পুরাতন সমাজের মূল্যবোধগুলোও সমাজ প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে অচলায়তন সৃষ্টি করল। একারণেই, ইউরোপীয় রেনেসাঁস এর সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা হয়ে উঠেছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রাণ। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই দেখা যায় ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় আর রাষ্ট্রের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নয়।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিতাড়িত হলো। এটি এমন একটি সময়ে ঘটল যখন বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ আর তার অবাধ বিকাশের স্তরে নেই। বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করে একচেটিয়া রূপ নিয়েছে; ফলে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। ইতিমধ্যে, জনগণ ক্রমাগত ক্রয় ক্ষমতা হারানোর ফলে তীব্র বাজার সংকোচন আর অতি উৎপাদনের সংকটজনিত কারণে

বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সৃষ্টির হয়েছে। ফলে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা দুটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই ইংরেজদের অধীনে সীমিত পুঁজি বিকাশের সাথে সাথে একটি বিকাশমান শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়েছে। ফলে ইংরেজ এবং ভারতীয় উঠ্তি পুঁজির মালিকরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এর কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়ার নানা উপাদান জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি উস্কে দিয়ে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে।

এযুগে বুর্জোয়াদের ধর্মনিরপেক্ষ, সেক্যুলার চিন্তা নিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব একারণে যে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় এবং কায়েমী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটানোর লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা একটি বড় অস্ত্র। বাংলাদেশে এখন যেন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ কেন! সমগ্র পৃথিবীতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা সাম্প্রদায়িক অনুভূতি উস্কে দিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে জেরবার হয়ে যাচ্ছে। সেকারণে বর্তমানে প্রতিটি মহাদেশ আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যায় আক্রান্ত। বলকান, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনর, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকার দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিচ্ছে। ১৯৭১ সালে পাকসেনা এবং তাদের দোসর রাজাকার বাহিনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরসহ ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের হত্যা করেছে। অর্থাৎ ধর্ম যখন সাম্প্রদায়িকতারূপে চর্চা হয় তখন তা কতখানি বিভৎস ও নিষ্ঠুর রূপ লাভ করে তার অজস্র উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। যতক্ষণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, পড়হাবহঃরড়হ ও ঢ়ৎবলঁফরপব এর বিরুদ্ধে সমাজে লড়াই না হবে, ততক্ষণ ধর্মান্ধতার বিষয়গুলি সমাজে টিকে থাকবে। বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থে কখনও একে উস্কে দেবে, কখনও একে দমন করবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতই অপর একটি সমস্যা পুঁজিবাদী সংস্কৃতিরই একটি উপজাত - তা হলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর শাসকগোষ্ঠির জাতিগত নিপীড়ন। বিদেশি শাসকদের মতো করে এসকল জনসাধারণের উপর বাংলাদেশ সরকার জবরদস্তিমূলক নিপীড়ন চালাচ্ছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের নীতি চালু রেখেছে। এসকল জনগণ এদেশেরই নাগরিক। বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগণ সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে ছিলেন তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু এঁরা কখনই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়ায়নি। এর ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এসকল নৃ-গোষ্ঠির মানুষ তাদের অধিকার থেকে সর্বদা বঞ্চিত হচ্ছে। সমতল থেকে ছিন্নমূল গরীব মানুষদের পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তোলার চক্রান্ত হচ্ছে। এটি করতে গিয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের পক্ষ থেকে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে তাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে অলিখিতভাবে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত সেখানে ভূমি দখল করা হচ্ছে, মালামাল লুট ও হত্যা, উপাসনালয় পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, বর্বর অত্যাচারের শিকার হচ্ছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীরা। এভাবে এসকল নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করতে হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সমতলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের ভূমি কমিশন গঠন, তাদের মন্দির, মঠ-গির্জা, উপাসনালয়, শ্মশান ও সমাধিস্থল ভূমিদস্যু ও দখলদারদের হাত থেকে রক্ষা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নসহ তাদের উপর সামরিক বাহিনীর জুলুম-নির্যাতন বন্ধ, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, তাদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা, চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা পদ্ধতি বজায় রাখা ইত্যাদি। এসকল দাবির সাথে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি একাত্ম।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণে বিভ্রাট ও বাম রাজনীতির মতবিরোধ

বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত করুণ কারণ দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সামনের কাতারের নেতারা প্রায় উন্মোচিত। সংসদের কার্যকলাপকে সীমিত করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা অনুগত, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সীমাহীন কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের ভিত রচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির প্রতিহিংসাপরায়ন ধারার পাশাপাশি বাম রাজনীতির চিত্রও খুব আশাব্যাঞ্জক নয়। সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নানাধরনের তত্ত্বগত বিভ্রাট নানা বিভেদের জন্ম দিয়ে বাম রাজনীতির শক্তিকে ক্রমাগত দুর্বল করছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর এই বিরোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণে বড় ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত পার্টিটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অমার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্য বহন করায় এই দেশের রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ও বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে। স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে ভারতের বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে একচেটিয়া ভারতীয় পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে, মাল্টিন্যাশনালের অংশীদার হয়েছে, বৃহৎ ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে, অথচ ওখানকার সিপিএম, সিপিআই, সিপিএমএল গোষ্ঠীগুলো এখনও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে মিত্রশক্তি গণ্য করে জনগণতান্ত্রিক ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আওড়ে যাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। এই দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোও একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে। লেনিন বলেছেন, "State power in Russia has passed into the hands of a new class, namely the bourgeosie and land owners who had become bourgeosies. To this extent the bourgeosies-democratic revolution in Russia is completed" অথচ সেইসময়ে একথা লেনিন বলেছিলেন, যখন রাশিয়ার কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য ছিল এবং শিল্পে বিদেশি পুঁজির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিকই নির্ধারণ করেছিলেন। On the Fundamental Questions of the Revolution-এ তিনি বলেছেন, "The key question of every revolution is undoubtedly the question of state power, which class holds the power

decides everything.” অর্থাৎ, “রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নটিই প্রতিটি বিপ্লবের মূল প্রশ্ন। কোন্ শ্রেণী ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিচারটিই চূড়ান্ত।” কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, একটি দেশের রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণে কোন শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো সেটিই প্রধান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন বিদেশি শাসনের অবসান ঘটল তখন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে যে উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজিবাদী তার প্রমাণ কি! একটি দেশের উৎপাদন পদ্ধতি নিরূপনে সেদেশের পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা এবং উৎপাদন সম্পর্ক মালিক-মজুর। পণ্য উৎপাদনের এই উদ্দেশ্য এবং এ ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক শিল্প, কৃষি, পরিষেবা প্রভৃতি খাত নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এছাড়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাজার জাতীয় বাজারে পরিণত হয়েছে এবং অর্থনীতি স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণে সবচাইতে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি হয় কৃষির চরিত্র নির্ধারণে। বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে ১৯৫০ সালে। এরপর থেকে পুরোপুরি পুঁজিবাদী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জমিদারদের পরিবর্তে গ্রামীণ বুর্জোয়া বা জোতদারদের প্রাধান্য আসে। জমির মালিককে সরকারি কোষাগারে নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদান করতে হয়। জমির মালিক ক্রয়-বিক্রয় ও খাজনা প্রদান করতে পারে। কৃষিতে মালিক বিনিয়োগ করে এবং মজুরি খাটায়। পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির কারণে এই মজুরি বিভিন্ন প্রকার। কোথাও মজুরি টাকায় নিয়ে থাকে আবার কোথাও ফসলের ভাগ নেয়। এইসকল চাষীদের ভাগচাষী বলে। এসকল চাষীদেরও আবার দু'চার বিঘা জমি আছে। মালিক-মজুর উৎপাদন সম্পর্ক, মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন, শ্রমবিভাগ, আধুনিক উৎপাদন উপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ধনতান্ত্রিক। মহাজনী পুঁজি, বন্ধক, ইজারা প্রভৃতির আঙ্গিক যাই হোক না কেন তার চরিত্র ধনতান্ত্রিক।

মার্কসবাদে আন্তঃসম্পর্কের নিরিখে সকল কিছুর বিচার বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি শুধুমাত্র মহাজনী পুঁজি বা বন্ধক বা ভাগচাষ দেখে তাকে সামন্তীয় উৎপাদন পদ্ধতি বলেন তবে তাঁর বিচার পদ্ধতি কখনই মার্কসবাদ সম্মত নয়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বাম রাজনৈতিক দলসমূহ এভাবে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করে রণনীতি এবং রণকৌশল নির্ধারণ করছেন। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র কেউ আধা সামন্তবাদ বা প্রাক পুঁজিবাদ বলছেন। কেউ আবার মনে করছেন বাংলাদেশ এখনও স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি। কাজেই তাঁরা এ দেশে বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বলছেন। কোনো কোনো বামপন্থী দল আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করেন। এরা মূলত ক্রুশ্চেভাইট যারা এক সময়ে সোভিয়েতের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে ইয়েলেৎসিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্টি বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন এবং এঁদের পার্টি বিলুপ্ত করে বুর্জোয়া পার্টিতে আত্তীকরণের ইতিহাস রয়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের তত্ত্বগত বিভ্রান্তি এ জায়গায় চলে গেছে যে তারা এখন শোধনবাদী neo-marxist ধারণার অনুসারী। এ ধারণার প্রবক্তারা দর্শনে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদকে মার্কসবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় এবং অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে একচেটিয়া রূপ কার্যকরী বলে মনে করে আর রাজনীতিতে শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র কায়েম করায় বিশ্বাসী।

বাংলাদেশে বিপ্লবের পর্যায় এবং রণনীতি ও রণকৌশল

কমরেড লেনিন বিপ্লবের পর্যায় নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, “প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন।” স্ট্যালিন বলেছেন, “কোন শ্রেণী অথবা কোন শ্রেণীগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত; কোন শ্রেণী অথবা কোন শ্রেণীগুলিকে অতি অবশ্য উচ্ছেদ করতে হবে; কোন শ্রেণী অথবা কোন শ্রেণীগুলি ক্ষমতা দখল করবে – এটাই হলো প্রত্যেকটি বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন।” কমরেড শিবদাস ঘোষ যে কোন দেশের রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে তুলে ধরে দেখালেন যে মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়। এ প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ উল্লেখ করেছেন, “... তিনি (লেনিন) ‘এপ্রিল থিসিসে’র মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এতদিনকার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে একটা তীব্র আঘাত করলেন। তিনি বললেন এবং বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে ভাল করে প্রথমে একটি কথা দেখিয়ে দিলেন যে, মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয় যার উপর ভিত্তি করে লেনিনের এই মূল্যবান বক্তব্যটি দাঁড়িয়ে গেছে যে, ‘পলিটিকস্ অল্ওয়েজ সুপারসিড্স্ ইকনমি’ – অর্থাৎ পুঁজিবাদের এই যে অসম বিকাশ হয়েছে এবং বিপ্লবের যে ‘টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন’, ‘জিগ্জ্যাগ্’, আঁকাবাঁকা রাস্তা - কখনও এগোনো, কখনও পেছনো - এই ‘টাস্‌ল্ এর (লড়ালড়ির) মধ্যে, আজকের দিনে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে এবং তারই নিয়ামক শক্তির মতো অবস্থান করছে। রাজনীতির সাথে অর্থনীতির সম্বন্ধ কেউ যদি এইভাবে না বুঝে এরকমভাবে বোঝেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টায়, রাজনৈতিক স্থিতি পাল্টায়, আবার অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টায়, রাজনৈতিক স্থিতি পাল্টায় তাহলে তার পক্ষে মার্কসবাদের নামে অন্য কিছু বোঝা হয়, মার্কসবাদ বোঝা হয় না।” রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিচারই যে বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন সেটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ পুনরায় উল্লেখ করেন যে, “...রুশ দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিকোলাই জারকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে সেখানে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর নিকোলাই জারের বদলে অর্থাৎ একটি পুরনো শ্রেণীর বদলে একটি নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে - সেটি হচ্ছে রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী। ... বিপ্লবের প্রধান প্রশ্নটি যেহেতু রাজনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নের সাথে জড়িত সেইহেতু নিকোলাই জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা যে মূহুর্তে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর করায়ত্ত হয়েছে এবং একটি পুরনো শ্রেণীর জায়গায় একটি নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে ‘টু দ্যাট এক্সটেন্ট’ (ততদূর পর্যন্ত) এবং সেই অর্থে, সেই দিক দিয়ে সেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে এবং রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করেছে।” সুতরাং রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণে লেনিনের শিক্ষা এবং পরবর্তীতে স্ট্যালিন এবং শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে –

ক) বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটি মীমাংসিত হয়েছে। এদেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। এবং পরবর্তীতে শাসকশ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী শক্তি হিসাবে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত করছে। কাজেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

খ) বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক কারণ এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে।

গ) বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক। তবে যেহেতু এদেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ তাই বিশেষত কৃষিতে সামন্তীয় অবশেষ ফর্ম হিসাবে বিদ্যমান। শিল্পেও জাতীয় পুঁজির বিকাশ পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশসমূহে যেভাবে হয়েছিল এবং তার ফলে সামন্তীয় সংস্কৃতির মূল উৎপাটন করতে হয়েছিল বাংলাদেশে শিল্প পুঁজির বিকাশের সময়কাল বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সময়ের সাথে মিলে যাওয়ায় শিল্পের সেই অবাধ বিকাশ আর সম্ভবপর নয়। যার ফলে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা সংস্কৃতির সামন্তীয় অবশেষের উপরই শুধু নির্ভর করছে না, তা থেকে আরো বিভৎস বিকৃত হিংস্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। কাজেই পিছিয়ে পড়া এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া এ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আনুষঙ্গিক কর্মসূচি হিসাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কাজেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের রণনীতি নিম্নরূপ :

বিপ্লবের মূল লক্ষ্য (Object of revolution) : রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং তার পরিবর্তে সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন।

বিপ্লবের মূল শক্তি (Main force of revolution) : সর্বহারা শ্রেণী।

বিপ্লবের মিত্র শক্তি (Strategic alliance) : সর্বহারাশ্রেণীর সাথে গরীব চাষী এবং গ্রাম ও শহরের অন্যান্য আধা সর্বহারা জনসাধারণের দৃঢ় শ্রেণী-মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে।

বিপ্লবের অন্যান্য মিত্র শক্তি (Immediate reserve) : সর্বহারাশ্রেণীর সাথে গরীব চাষী এবং গ্রাম ও শহরের অন্যান্য আধা-সর্বহারা জনতার এই দৃঢ় শ্রেণী-মৈত্রী গড়ে তোলার পরই তার ভিত্তিতে বিপ্লবের অন্যান্য মিত্রশক্তিগুলিকে (শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহ) বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসাবে টানতে হবে। যদিও বিপ্লবের পক্ষে এইসব শক্তিসমূহকে টানবার সময় মনে রাখতে হবে, এরা বিপ্লবের দেদদুল্যমান সহায়ক শক্তি। ফলে বিপ্লবের মিত্র হিসাবে এদের পেলেও এদের সম্পর্কে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে।

বিপ্লবের প্রধান বৈরী শক্তি : বুর্জোয়া শ্রেণী।

আঘাত হানার প্রধান দিক : সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক শক্তিসমূহ যারা ক্ষমতাশীল বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমজীবি জনতার মধ্যে আপোষকামী শক্তি।

বাংলাদেশে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে চূড়ান্ত বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করতে হবে। বিপ্লবের মূল শক্তি শ্রমিকশ্রেণীকে দাবি-দাওয়া ভিত্তিক অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের সুবিধাবাদী প্রবনতা থেকে মুক্ত করে শ্রেণীসচেতন এবং রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। কৃষিতে পুরানো কিছু সামন্তীয় অবশেষ ফর্ম হিসাবে থেকে গেলেও উৎপাদন সম্পর্ক যেহেতু চূড়ান্ত ধনতান্ত্রিক তাই কৃষিতেও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করার লক্ষ্যে শক্তিশালী দিনমজুর ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আনুষঙ্গিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি গরীব চাষী, মজুর, বিত্তহীন জনসাধারণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গনআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। সারাদেশে গড়ে ওঠা জনগণের আন্দোলনের নিজস্ব শক্তি এ সংগ্রাম কমিটিসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এভাবে বিভিন্ন দাবি আদায়ের সংগ্রাম করতে করতে এক পর্যায়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।